আগ্নেয়গিরি

প্রবোধকুমার সান্যাল



মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আগ্নেয়গিরি

তৃতীয় মুদ্রণ

—আড়াই টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীঅখিল গাঙ্গুলী

মুদ্রণ—ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩ কলেজ রো,

কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীপ্রদোষকুমার পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

আগ্নেয়গিরি

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত

করকমলেষু—

এই লেখকের

মহাপ্রস্থানের পথে
দেশদেশান্তব
আঁকাবাঁকা
তুচ্ছ
উত্তবকাল
বন্যাসঙ্গিনী
অবণ্যপথ
নদ ও নদী
নীচেব তলায়
জলকল্লোল
শ্রেষ্ঠগল্প
মধুচাঁদের মাস
ছোটদেব মহাপ্রস্থানের পথে

লবণ-হ্রদ হইতে শহর বেশী দূর নয়, মাত্র চার ক্রোশ। তাহারই কোল ঘেঁষিয়া এক বালুবহুল সঙ্কীর্ণ নদী হইতে একটা খাল বাহির হইয়া সোজা গ্রামের ভিতর চলিয়া আসিয়াছে। গ্রামের নাম রাজারহাট। বর্ষার দিনে খালে কিছু জল আসে, অতিবৃষ্টি হইলেও মাঠে জল উঠিয়া পড়ে, তারপর সারা বছর সে খালে জল থাকে না। ভিতর হইতে কাদা আর বালি উঠিয়া আপন দারিদ্র্য প্রকাশ করে।

প্রায় বছরখানেক হইতে চলিল, জেলা-বোর্ডের হেপাজতে খাল কাটিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। একটা অফিস বসিয়াছে। গ্রামের মেয়েপুরুষ চাষাভুষারাই কুলী-কামিনের কাজ লইয়াছে ; যাহারা মধ্যবিত্ত তাহারা লইয়াছে অফিসে লেখাপড়ার কাজ। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের আয় যৎসামান্য, প্রায়ই অর্থাভাবে দপ্তর বন্ধ থাকে, আবার কখনও জেলাবোর্ডের অনুগ্রহে কাজ আরম্ভ হয়।

যাহারা কাজ করিতে আসে, বুঝিতে হইবে সেই দুর্ভাগ্যদের কাজ আর কোথাও জুটে না। ঘরে তাহারা বসিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই ব্যাগার খাটিতে আসে। নিয়মিত চাকরি করিলেই যে নিয়মিত বেতন পাওয়া যায় ইহা তাহাদের নিকট একেবারে গল্পকথা। অনেকে মাহিনা না পাইয়া কাজে জবাব দিয়া যায়, আবার নূতন লোক আসে। এমনও দেখা যায়,

অবশ্য তাহা ভাগ্যেরই বিড়ম্বনা,—পুরাতন লোকই কোথাও কিছু উপার্জ্জনের সুবিধা না পাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বড়বাবুর কাছে হানা দিয়া পড়ে। তাহারা ভরসা রাখে, কাজ করিয়া গেলে একদিন না একদিন তাহারা প্রত্যেকে কিছু পাইবে।

অফিসে সবসুদ্ধ দশ বারো জন লোক। সকলের অবস্থাই সমান। কিন্তু সমান হইলেও নূতন বড়বাবুর দাপটে তাহাদের মাথা তুলিবার উপায় নাই, তাঁহার প্রবল প্রতাপে সকলেই আমরা সর্ব্বক্ষণ সশঙ্ক। কেরানীদের দুর্দ্দশা ও দুরবস্থার চেয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের স্বার্থের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব কিছু বেশী। একদিন তিনি প্রেসিডেণ্ট হইয়া বসিবার উচ্চাশা মনে মনে পোষণ করেন।

একদা অপরাহ্নে একটি লোক উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া কহিল, বড় বিপদে প'ড়ে এসেছি আপনার কাছে, আপনি রক্ষে করুন কর্ত্তা।

গড়গড়ার নলটা বড়বাবুর মুখে লাগানো ছিল, তিনি কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। শানিত তীক্ষ্ণ চক্ষু তুলিয়া বলিলেন, বিপদটা কি রকম শুনি?

এই নির্দ্দয় কণ্ঠস্বর উপস্থিত কাহারও অপরিচিত নয়। সে লোকটি কহিল, আমার চার মাসের মাইনে পাওনা আছে আপনার এখানে। যদি তার থেকে কিছু···দিন, আর চলছে না কর্ত্তা,—মেয়েটার কঠিন রোগ—

মেয়ের অসুখ ত বুঝলাম, কিন্তু কই বিপদের কথাটা ত বললে না হে?—বলিয়া বড়বাবু গড়গড়ার নলে একটা টান দিলেন। তাঁহার মুখে একটা হাসি লাগিয়াছিল।

অন্যান্য কেরানীরা তাঁহার দিকে তাকাইয়াছিল। তাহারা জানে, এই হাসিটুকুই তাঁহার ভয়াবহ চরিত্রের সুস্পষ্ট প্রকাশ।

লোকটা বলিতে লাগিল, দিন আর চলছে না কর্ত্তা, খাওয়া-পরা বন্ধ হয়েছে। যাদের কাছে ধার করেছি তারাও আসছে ধার চাইতে।

তাই নাকি? মজা মন্দ নয় দেখছি।

কিছু ব্যবস্থা করে দিন কর্ত্তা। উপবাস সইতে পারি, কিন্তু রুগী যদি ওষুধ না খেয়ে মরে···যখন সে মরে একটু একটু ক'রে—

বড়বাবু বলিলেন, জাতের খবর রাখো? জাতটাও যে মরছে ওমনি ক'রে! হ্যাঁ, তারপর? মেয়েটি তোমার কত বড়?

আমার বড় মেয়ে কর্ত্তা।—লোকটা বলিতে লাগিল, ঘরে ঢুকলেই বলে, পয়সা পেয়েছি কিনা····· দিন বড়বাবু, কিছু ব্যবস্থা ক'রে দিন,—বাপ হয়ে দেখছি রুগ্ন সন্তান মরছে না খেয়ে। আমার গতর-খাটানো পয়সা এমন ক'রে আট্‌কে রাখবেন না কর্ত্তা, আপনার পায়ে পড়ি—

বড়বাবু রাগ করিয়া কহিলেন, গতর খাটানো পয়সা বলে' আমাকে হুম্‌কি দিতে এলে, কেমন নিতাই?

নিতাই রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, কি বলতে কি বলে ফেলেছি,

আমার মাথার ঠিক নেই বড়বাবু।

মাথার ঠিক যদি না থাকে তবে বিন্ধেশ্বরীতে গিয়ে ডুবে মরো, আমি দাঁড়িয়ে দেখি।

নিতাই অবাক হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইল। বড়বাবু পুনরায় কহিলেন, একটি পয়সাও আমি এখন দিতে পারবো না।

চাটুয্যে আমাদের ভিতর সকলের চেয়ে স্পষ্টবাদী। সে মাথা হেঁট করিয়া এতক্ষণ ওপাশের একখানা তক্তার উপর বসিয়া নিঃশব্দে খাতাপত্র নাড়াচাড়া করিয়া কাজ করিতেছিল, বড়বাবুর কথায় সে হঠাৎ মুখ তুলিয়া তাকাইল। তীব্রকণ্ঠে কহিল, এ আপনার অন্যায় কথা বড়বাবু, এ ব্যবহার মানুষের যোগ্য নয়।

নলটা নামাইয়া বড়বাবু চাটুয্যের দিকে তাকাইলেন।

চাটুয্যে বিদীর্ণ কণ্ঠে কহিল, এমন ক'রে যে লোকটা এত দুঃখ জানালো তার প্রাণের দাম আপনার চেয়ে কম নয়। আপনি নিজে গিয়ে নদীতে আত্মহত্যা করুন ত দেখি ?

এমন নির্ভয় স্পষ্টবাদিতায় সকলেই বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইলাম। চাটুয্যে তিন মাসের বেতন পায় নাই। তাহার চোখে ও মুখে অপমানিত দারিদ্র্য যেন বিপ্লবের অগ্নিশিখায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে যেন সংযমের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বড়বাবু নীরবে একবার তাহার দিকে তাকাইলেন। ভাবিলাম আজ একটা কাণ্ড হইবে।

চাটুয্যে বলিল, একি আমাদের পাপ ? দারিদ্র্যের জন্য আমাদের অপমান করবেন পথের কুকুরের মতন ? আমরা আপনার দম্ভের দাসত্ব করতে এসেছি ?

বড়বাবু নিঃশব্দে একটি টাকা বাহির করিয়া দিয়া নিতাইকে বিদায় করিলেন। সে চলিয়া যাইবার পর গড়গড়ার নলটা রাখিয়া বড়বাবু চাটুয্যের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হাসিয়া ডাকিলেন, থামলে কেন হে? বলে যাও?

চাটুয্যে কহিল, গরীবের গলা বেশীদূর পৌঁছয় না, কি আর বলব বলুন?

বড়বাবু কহিলেন, তোমার আর একটু বয়স হ'লে বুঝতে—

মুখ তুলিয়া চাটুয্যে কহিল, কি বুঝতাম?

বুঝতে দম্ভটা আমার নয়, দম্ভটা হচ্ছে ওই চেয়ারখানার। অপবাধ আমার নয় চাটুয্যে। আর দারিদ্র্য? বছরে ছুটো বন্যা, চারটে ছুভিক্ষ, ছ'টা ভূমিকম্প! পাটের কাজ বন্ধ, ধানের জমি পতিত,—তুমি ত জানো ইউনিয়ন বোর্ডের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী! তোমাদের সকলের ছুর্ভাগ্যের বোঝা আমি ব'য়ে বেড়াই। আচ্ছা চাটুয্যে, তুমি আমার ভেতরের অবস্থাটা জেনেছ কোনোদিন?

তাঁহার গলার আওয়াজে চাটুয্যে পর্য্যন্ত বিস্মিত হইল। বড়বাবু গভীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন, রাগ ক'রো না ভাই, এ-পাপ সকলের, এ-পাপ সমস্ত জাতটার! আর দম্ভ? এত সহজে আমাকে বিচার ক'রো না!

চাটুয্যে কহিল, আমাকে ক্ষমা করুন বড়বাবু।

বড়বাবু তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া পুনরায় কহিলেন, দম্ভের মুখোসটা প'রেই বেঁচে আছি নইলে মানুষ ব'লে পরিচয় দেবার মতন আর কিছুই নেই!

নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পিছন হইতে তাঁহার তালিমারা ময়লা পাঞ্জাবিটার দিকে সকলে চাহিয়া রহিলাম।

*

* *

জানালাটা বন্ধ। বাহিরে জ্যোৎস্নারাত্রি। মোমবাতির আলোটা বাতাসে নিবিয়া যাইবে বলিয়া মাথার দিক্‌কার জানলাটা বন্ধ করিয়াছি। রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছিল। পথে মানুষের সমাগম কমিয়া গেছে।

হাতের কলমটা থামাইলে চলিবে না, এই প্রবন্ধটি শেষ করিয়া না দিলে আগামী কাল সম্পাদক মহাশয়ের নিকট তিরস্কৃত হইব। এত কষ্ট করিয়া চাকরি পাইয়াছি, সেই চাকরি লইয়াই হয়ত টানাটানি পড়িয়া যাইবে। প্রবন্ধ শেষ না করিলেই চলিবে না।—

'সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি যদি কর্ত্তৃপক্ষের এতই করুণা ও বিবেচনা, তবে হিন্দু বাঙালী সম্প্রদায় তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে কেন? শিক্ষায়, সভ্যতায়, ধনসম্পদে হিন্দুরাই অগ্রণী, রাজস্ব হিন্দুরাই বেশী দিয়া থাকে, কিন্তু আজ সামান্য একটা কলমের খোঁচায় ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া হিন্দুদিগকে ভেদনীতির মধ্যে আনিয়া তাঁহারা যেরূপ সাম্প্রদায়িকতার চক্রান্তে—'

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছি, আরো খানিকটা লিখিতে হইবে, এমন সময় বাহিরে কি-যেন শব্দ হইল। গভীর মনঃসংযোগের অবস্থায় সামান্য শব্দ হইলেই চমকিয়া উঠিতে হয়। মোমবাতিটা কমিয়া আসিয়াছে, তাহার আলো স্বভাবতই ক্ষীণ। মাথা তুলিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইলাম, বারোটা বাজিতে কিছু বিলম্ব রহিয়াছে। একথা ভুলি নাই বাহিরে শরৎকালের সুন্দর রাত্রি, চন্দ্রকিরণে চারিদিকে পরিপ্লাবিত,—কিন্তু আজ তাহার মহিমা দেখিবার সময় নাই, প্রবন্ধ শেষ করিতে হইবে।

'জাতির আজ বড় দুর্দ্দিন। গৃহবিবাদ, অর্থসঙ্কট, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, ইহাদের সহিত যদি তাহার রক্তে সাম্প্রদায়িকতার বিষ মিশ্রিত করিয়া কলহবিবাদকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখা যায় তবে—'

আবার বাহিরে শব্দ পাইয়া সচকিত হইলাম। কেমন যেন একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ। আমার ঘরের পাশে কিম্বা বাহিরে, কিম্বা এই প্রকাণ্ড বাড়ীটার কোনো এক অংশে—তাহা কিছুই বুঝিলাম না। কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম, কিন্তু দেখিতে দেখিতে সেই শব্দ আবার অখণ্ড নীরবতার মধ্যে ডুবিয়া গেল।

'হিন্দু-মুসলমানের আন্তরিক ঐক্য সম্পাদন করিতে হইবে, যুক্তনির্ব্বাচনের দাবি করিয়া প্রচার-কার্য্য চালাইতে হইবে, সকল প্রদেশকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে—হিন্দুরা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত এই বাণীই প্রচার করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ পক্ষপাতিত্বের চাকার তলায় তাহাদের—'

অকস্মাৎ হাতের কলমটা পড়িয়া গেল। কি-যেন একটা শব্দে ভয় পাইয়াছি, সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল। পথের দিক্‌কার দরজাটা খুলিয়া বাহিরে আসিলাম। বাতাস বহিতেছিল, আকাশে বড় বড় তারা। উপরে ছাদের পাঁচিলে চাঁদ ঢাকা পড়িয়াছে, জ্যোৎস্নায় চারিদিক স্বপ্নলোকের মতো দেখিতেছিলাম। কোথাও কাহারও সাড়া নাই, কেবল নিকটের একটা বাজারের ভিতর কয়েকজন লোক ডুগি বাজাইয়া গান করিতেছিল।

দরজা হইতে গলির পথে নামিলাম, সরকারী আলো এদিকে নাই। এই বাড়ীটা যেন কোন-এক জমিদারের। উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রকাণ্ড বিস্তৃত চারিতলায় অসংখ্য খণ্ড খণ্ড পরিবার ভাড়া থাকে। কলিকাতায় এমন একটি বাড়ী যাহার আছে তাহাকে আমরা ধনী বলিয়া থাকি। যাহা হউক, এখানকার বাসিন্দারা একজন আর একজনকে চিনে না, কাহারও সহিত কাহারও সংস্পর্শ নাই। আমি এই বাড়ীর সর্ব্বশেষ প্রান্তের নীচের তলায় একটি ক্ষুদ্র ঘর ভাড়া লইয়াছি। সাত টাকা ভাড়া দিই।

এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিলাম, দোতালার কোণে একটা ঘরের ভিতর হইতে আলোর ক্ষীণ একটি রেখা জানলার খড়খড়ির ফাঁকে পড়িয়াছে। বুঝিলাম শব্দটা ওখানকার! আমি জানি একটি ক্ষুদ্র পরিবার ওই ঘরটিতে ভাড়া থাকে। কাঠের সিঁড়ি দিয়া উহারা আমারই ঘরের সুমুখ দিয়া দিনের বেলা যাতায়াত করে তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। যুবকটির চাকরি-বাকরি নাই,

খবরের কাগজ বিক্রয় করে; আগে যেন কোন্ এক ঔষধ-বিক্রেতার মাল বেচিয়া কমিশন পাইত, কিন্তু সেকাজ এখন নাই। আমার নিকট আসিয়া মাঝে দুই-একদিন কয়েকখানা সাপ্তাহিক কাগজ বিক্রয় করিয়া গিয়াছিল।

আওয়াজ পাইলাম। গলিপথের নীচে দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র আমিই সেই আওয়াজ শুনিলাম, এই সুবিস্তৃত সাতমহলায় তাহা আর কাহারও কানে গেল না। ভাবিলাম, বুঝিতে পারিয়াছি, এইবার চলিয়া যাই কিন্তু পুনরায় কেমন একটা আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমার কৌতূহল হইল, কাঠের সিঁড়ি দিয়া কয়েকটা ধাপ উঠিয়া জানলার ফাঁকে নিঃশব্দে উঁকি মারিলাম। ভিতরে কিছুই দেখা যায় না। দেখিবার কিই-বা থাকিতে পারে! স্বামী,স্ত্রী, একটি শিশুসন্তান, সামান্য ঘরকন্না, নিত্য অভাব-অনটন,—দেখিবার মত কিছুই নাই, শুনিবার মতোও ইহাদের নূতন কোনো তথ্য ছিল না। নিজের বিশ্রী কৌতূহলের জন্য নিজেই আমি লজ্জিত হইলাম।

'আঃ, আঃ, কি খাওয়ালে আমাকে?'—চমকিয়া উঠিলাম। নারীকণ্ঠের স্খলিত আর্ত্তনাদ।

'ওষুধ!'—পুরুষের কণ্ঠে উত্তর শুনিলাম।

'কী ওষুধ? বলো তুমি, শিগগির বলো……আঃ জ্ব'লে যাচ্ছে।'

'কেন অমন করো? বড় চঞ্চল তুমি! ভয় কি, আমি ত আছি!'

'না, না, তুমি নেই,—মানুষ নেই, বিচার নেই। জ্ব'লে গেল!'

মুখ সরাইয়া লইলাম। আকাশে কয়েকটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে তাকাইলাম। যাহা শুনিলাম তাহাতে কিছুই বুঝা গেল না, কেবল এইটুকু বুঝিলাম, বউটিকে কি-যেন ঔষধ খাওয়ানো হইয়াছে; পৃথিবীতে মানুষ নাই, বিচার নাই, সব জ্বলিয়া যাইতেছে। কিন্তু কে বলিল, মানুষ নাই, বিচার নাই? কে বলিল, সব জ্বলিয়া যাইতেছে? আমার প্রবন্ধে হিন্দু পাঠকরা কি আগ্নেয়গিরির মতো ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছে? একদিন কি তাহারা জ্বলন্ত অঙ্গার উদ্‌গিরণ করিয়া সমগ্র বিরুদ্ধ শক্তিকে ছারখার করিয়া দিবে? কেন, কোথা দিয়া অসন্তোষ জমা হইয়াছে? বউটি কী বলিল?

'চেঁচিয়ো না, লক্ষ্মীটি। দেখচ ত, রাত গভীর। সেরে যাবে, আমি বলছি সেরে যাবে। টাকা নেই, সহায় নেই, তাই বলে কি তুমি কষ্ট পাবে? না, ডাকাতি ক'রে আনব টাকা? ওই ছাখো, খুকী ঘুমোচ্ছে, কেমন সুন্দর খুকী তোমার, কেমন শান্ত!'

আঃ যন্ত্রণা দিয়ো না, তুমি খুনে, অক্ষম, কাপুরুষ,—বাবারে, জ্ব'লে গেল। কেন তুমি চাওনা সন্তান, কেন ভয় এত? যাও, দূর হয়ে যাও, গরীবের মেয়ে এনে অত্যাচার করতে দেবো না। তোমার ভালো হবে? তোমার ভালো হতে পারে না!'

'কেন, মলিনা?'—পুরুষের কণ্ঠ যেন কান্নায় কাঁপিতে লাগিল। '—তোমার জন্যে কুকুরের মতন দরজায় দরজায়··· তুমি নিশ্চয় জানো আমি নিরপরাধ। কে দেখবে আমাদের? ওরা নরপিশাচ, ওরা ধনী, ওরা জানে না দরিদ্রের বুকের ভেতরের—'

বউটি কহিল, 'এদিকে এসো, আরো কাছে···না না, গালাগালি তোমাকে দিই নি। রাগ করেছ? ওগো তোমারই ভালো হবে, তোমারই আসবে সুদিন। না, না, ঘুমোও চুপ ক'রে, ঘুমোও।'

'কষ্ট হচ্ছে মলিনা?'

'কষ্ট!'

হঠাৎ বউটির কান্নার শব্দ শুনিতে পাইলাম। কষ্ট তাহার হইতেছে কিনা তাহা কেবল বোধ করি সে কাঁদিয়াই জানাইতে পারে। কেন তাহার কষ্ট, কী অসুখ, তাহাই বুঝিবার জন্য এখানে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু কোনোক্রমেই তাহা শুনিতে পাইলাম না। তবে কি সে সত্যই জ্বলিয়া যাইতেছে? জ্বলিয়া যাওয়াটাই কি তাহাব অসুখ? কিন্তু আকাশের একটি নক্ষত্রও আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারিল না। ক্লান্ত হইয়া এক সময় চলিয়া আসিলাম। কেবল এইটুকু জানা গেল, আর যাহাই হউক, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য নাই, পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক মমত্ববোধ রহিয়াছে। কলহ-বিবাদটা বাহিরের, ভিতরের নহে।

নিজের ঘরে আসিলাম। আর লিখিবার উৎসাহ নাই। ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করিয়া শব্দ কবিতেছে, চাহিয়া দেখিলাম রাত্রি সাড়ে বারোটা। কিন্তু একি, আমার প্রবন্ধের শেষ দুইটা পাতা পুড়িয়া গেল কেমন করিয়া?

বাতিটা প্রায় ফুরাইয়াছে, তবে কি কাগজ দুইখানা হাওয়ায় কাঁপিয়া শিখার উপর পড়িয়াছিল? হ্যাঁ, তাহাই হইবে,

দেখিলাম কাগজগুলি ওলটপালট হইয়া আছে। আমার দুই ঘণ্টার পরিশ্রম।

ঘুমাইবার আগে অন্ধকার ঘরের মধ্যে শুইয়া ভাবিতেছিলাম, আমি কি মিথ্যা কথা লিখিয়াছি? তবে কি আবেদন জানাইবার কাজ এতই অলীক? তবে কি প্রবলের পায়ের তলায় পড়িয়া বিচারের বাণী চিরদিন নীরবে কাঁদিতে থাকে?

অস্পষ্ট কথায় বউটি কী কথা শুনাইল?

সকালবেলা চা তৈরী করিয়া খাইতে বসিয়াছিলাম, এমন সময় হঠাৎ দরজায় দুইটা টোকা দিয়া কে ডাকিল, ঘরে আছেন নাকি?

সাড়া দিয়া কহিলাম, কে?

আজ্ঞে আমি, রজনী।

ও, ভেতরে আসুন।

দরজা ঠেলিয়া গতরাত্রির যুবকটি ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, কিছু মনে করবেন না, একটু বিরক্ত করতে এলুম। আপনাকে কাগজ দিয়েছিলুম তার জন্য আনা তিনেক পয়সা—

ব্যস্ত হইয়া পেয়ালা রাখিয়া তাহাকে পয়সা বাহির করিয়া দিতেছিলাম, রজনী সবিনয়ে কহিল, তাগাদা দিয়ে ভারি লজ্জা পাচ্ছি, বিশেষ দরকার কিনা—

হাসিয়া বলিলাম, সে কি কথা, লজ্জা বরং আমারই, আপনাকে ডেকেই পয়সা দেওয়া উচিত ছিল।

রজনী কহিল, কাগজের অফিসে টাকা জমা দিলে তবে

আবার নতুন কাগজ পাবো। এক সঙ্গে দেবার সময় ভারি অসুবিধে হয়। যে দিনকাল, টাকা জমা না দিলে ওরা বিশ্বাস করে না। তা ছাড়া এদিকে আবার অসুখ-বিসুখ—

তাহার হাতে পয়সা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কা'র অসুখ ?

এই আমার স্ত্রীর, শরীর ভালো নয় কিনা। বলিয়া রজনী মাথা হেঁট করিল। পুনরায় কহিল, একটু মাথার দোষও আছে। মানে ইন্‌সানিটি নয়, তবে সহজে অস্থির হয়ে পড়ে।

বলিলাম, আপনার একটি মেয়ে আছে না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, এই দেড় বছরের হোলো ; একটু একটু কথা বলতে শিখেছে। কিন্তু দেখছেন ত, ভারি বিপদে পড়েছি। কাগজ বিক্রি ক'রে ক'টাকাই বা হয় ! ঘর ভাড়া, সংসার খরচ, জামাকাপড়, মেয়ের দুধ,—আচ্ছা, আপনাদের অফিসে কোনো সুবিধে হ'তে পারে ?

বলিলাম, আমিই সেখানে সম্প্রতি ঢুকেছি ; আগে য়্যাপ্রেন্টিস্ ছিলুম, এখন সামান্য কিছু পাই।

যদি কোনো খোঁজ পান তবে দয়া ক'রে আমাকে জানাবেন, আই-এ পর্য্যন্ত পড়েছি। অবশ্য এদিকেও একটা কাজের চেষ্টা করছি। তবে কি জানেন, মুরুব্বীর জোর না থাকলে কিছু হয় না। আচ্ছা, নমস্কার।—রজনী চলিয়া গেল। দুই মিনিট পরে আবার সে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আর একটি কথা আপনাকে বলব। আপনার এখানে কোনো পরিচিত ডাক্তার আছেন ?

তাহার আকুলতা দেখিয়া আমার কৌতূহল হইল। কিন্তু

তাহা দমন করিয়া কহিলাম, একজনের সঙ্গে জানা আছে, তিনি হোমিওপ্যাথ।

হোমিওপ্যাথ? না, তাহ'লে চলবে না। আমার স্ত্রীর জন্যে বলছিলুম। ওঁর শরীরের মধ্যে, মানে য়্যাড্‌ভান্‌স্‌ড্‌ ষ্টেজ কিনা—

রজনী আবার চলিয়া গেল। ধীরে সুস্থে চা খাইয়া আমি আমার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ শেষ করিতে বসিলাম। কিন্তু কলম ধরিয়াই রজনীর চেহারাটা চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। একদিন স্বাস্থ্য তাহার ছিল, দেখিয়াই মনে হয়। তাহাব বিনয়, তাহার সৌজন্য, অথচ অপরাধীর মত কুণ্ঠিত। কিন্তু কেন? দুর্ব্বলের উপর এত বড় বোঝা কে চাপাইল? অন্যায় কিছু করে নাই, তবে এই অভিশাপ কেন সে টানিয়া বেড়াইবে?

নূতন প্রবন্ধ আরম্ভ করিতে বসিয়াছি এমন সময় গত রাত্রির মতো চীৎকারের শব্দে মুখ ফিরাইলাম। ইহা যে রজনীর স্ত্রীরই গলার আওয়াজ তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। এই দিনের আলোতেও কেমন করিয়া যেন ভয় পাইলাম। অথচ ভয় পাইবার কোনো কারণ নাই। এমন পরিবার আমাদের চারিপাশে আছে সহস্র সহস্র, তাহাদের গলার আওয়াজ কেবল কানে আসিয়া পৌছায় না এই মাত্র। যেদিন তাহাদের সকলের সম্মিলিত চীৎকার শুনিব, সেদিন তাহাদের উত্তপ্ত নিশ্বাসে সমগ্র দেশে আগুন লাগিবে কিনা তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। রজনী বলিয়াছে, আর কিছু নয়, তাহার স্ত্রীর মাথার দোষ আছে। আমিও তাহা বিশ্বাস করিলাম। মাথার দোষ আছে বলিয়াই

সে পৃথিবীতে মানুষ দেখিতে পায় না, বিচার বুঝিতে পারে না; মাথার দোষ আছে বলিয়াই তাহার চোখের সম্মুখে সব জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল!

আবার লিখিতে বসিলাম।—

'শিক্ষিত বেকার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে গভীর অসন্তোষ দিনে দিনে জমা হইতেছে, আত্মপ্রকাশের সুযোগ না পাইয়া যে বিপুল পরিমাণ বিরক্তি তাহাদের ভিতরে ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহার শীঘ্র প্রতিবিধান না করিলে ফল ভালো হইবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে যুগে যুগে যাহারা নূতন পথ কাটিয়াছে, নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে, নব্য সমাজ গঠন করিয়াছে, অরণ্যে-পর্ব্বতে-সাগরে-আকাশে যাহারা অদম্য উৎসাহে অভিযান করিয়া বিজয়ীর বরমাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়াছে,—আমাদের দেশে সেই যৌবনশক্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া মুক্তি চাহিতেছে।'

হঠাৎ মনে হইল মিথ্যা কথা লিখিতেছি। ইহা সত্য নয়, আমার মনের বিলাস মাত্র। কোথাও কেহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া নাই, অবাধ মুক্তিতে দেশের যৌবন-শক্তি দিব্য আরামে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। আমার এই রচনা সম্পাদক মহাশয় দেখিলে হাসাহাসি করিবেন। তাঁহার সেই চেহারাটা কল্পনা করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ লেখাটা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

থাক্ প্রবন্ধ! স্নান করিয়া ঘরে তালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রবন্ধ লিখিলে পাঠক হয়ত পাইব, বাহবাও হয়ত দিবে, কিন্তু সমস্যা সমস্যাই থাকিয়া যাইবে। অধঃপতনের লজ্জার কথা লিখিয়া কান্নাকাটি করা সংবাদপত্রের পেশা;

তাহাতে আবেদনের পর আবেদন আছে, কিন্তু দাবি নাই, প্রতিবিধান নাই। মনে পড়িয়া গেল, এইরূপ প্রবন্ধ রচনা করাই আমার চাকরি, মন-ভোলানো কথা না লিখিলে আমার অন্নসংস্থান হইবে না; কথার পর কথা সাজাইয়া বিক্রয় করিলে তবে পয়সা পাইব। সংসারে কিছুর প্রতিই যে আমার আস্থা নাই এই কথা কয়জন মানুষ জানে।

রৌদ্র উঠিল এবং সেই রৌদ্র মাথার উপর আসিল। পথ হাঁটিয়া শ্রান্ত হইলাম। বাজারের ভিতর দিয়া আসিয়া বাঁ-হাতি সরু গলির মধ্যে ঢুকিলাম। এমন সময় পিছন হইতে ডাক পড়িল।

মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, রজনী। রৌদ্রের আলোয় তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। মনে হইল, পৃথিবীর সমস্ত কারুণ্য আর দুঃখ যেন ওই মুখখানিকে জড়াইয়া আছে। উহার মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নাই, তাহার বদলে অসহায়তা আর ভয়, হত্যাকারীর মতো সে যেন অপরাধকুণ্ঠিত।

কাছে আসিয়া কহিল, আচ্ছা, হাসপাতালে যদি দিই তবে কি সুবিধে হ'তে পারে?

কহিলাম, অসুখ কি খুব?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় বিপদ আমার। অথচ টাকা নেই, ওদিকে একটা তাগাদা ছিল···আমি যে কী করি—

হঠাৎ কেমন একটা অদ্ভুত আসক্তি আমার হইল। তাহার হাতটা ধরিয়া বলিলাম, আপনার খাওয়া হয়নি দেখছি, আসবেন আমার সঙ্গে?

রজনী যেন থতমত খাইয়া গেল। আমি তাহার নিকট আজিও অপরিচিত, আমার নিকট হইতে এমন অনাহূত আত্মীয়তা সে আশা করে নাই। অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, কোথায় যেতে বলেন ?

আসুন। বলিয়া তাহাকে আমি যে-হোটেলে খাই সেইখানে ধরিয়া লইয়া গেলাম। খুচরা পয়সা দিলে এখানে ভাত-তরকারি পাওয়া যায়। আমরা দুইজনে খাইতে বসিলাম।

রজনী কহিল, তিন-চার দিন আমাদের রান্নাই হয়নি। উনি বিছানায় প'ড়ে, আমারও ছুটোছুটি। খাবার এনেই চালাচ্ছিলুম। খুকিটা আবার নতুন ভাত খেতে শিখেছে কিনা—

তাহার কথা শুনিলাম। কিন্তু আমি অন্য প্রশ্ন করিলাম। কহিলাম, আপনি বিয়ে করেছেন কতদিন ?

ভাত খাইতে খাইতে রজনী কহিল, বিয়ে করিনি, বিয়ে দিয়েছে। মা-বাবা বুড়ো হয়েছেন, তাঁদের সাধ—

সেই অতি পুরাতন কাহিনী। সে বলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তাহা আর আমার শুনিবার প্রয়োজন ছিল না ; শত শত অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি বলিয়া মনে হইল। দুইজনে আহার শেষ করিয়া উঠিলাম। বাহিরে আসিয়া রজনী কহিল, কোনো হাসপাতালে আপনার জানাশোনা আছে ?

বলিলাম, জানাশোনা না থাকলেও চলবে। আপনি সেবাসদনে নিয়ে যান।

আমার মুখের উপরে সে বোধ হয় একটা সহানুভূতির ছায়া

দেখিতে পাইল। সবিনয়ে কহিল, যদি দরকার হয় তবে আমায় একটু সাহায্য করবেন এই আমার অনুরোধ—

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সেদিন সবেমাত্র অফিসে বসিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময় রজনী ছুটিতে ছুটিতে আমার টেব্‌লের কাছে আসিয়া হাজির। অনেক লোক ছিল, তাহাদের পাশ কাটাইয়া সে রুদ্ধশ্বাসে চুপি চুপি কহিল, একবার যদি আসেন দয়া ক'রে, উনি আমার সঙ্গে হাসপাতালে যেতে চান্ না। আপনি একটু আসুন—

তাহার সহিত নীচে আসিলাম। দেখি পথের উপরে একখানা ভাড়াটে গাড়ী দাঁড়াইয়া। জানলাগুলি বন্ধ। তাহার স্ত্রীকে দেখা গেল না, বুঝিলাম ভিতরে অনড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। রজনী কহিল, আসুন গাড়ীর ভেতরে। না না, খুব জায়গা হবে, কোনো অসুবিধে নেই, আপনি আসুন।

আমাকে একরূপ টানিয়াই সে গাড়ীর ভিতরে তুলিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বর্ণনা করিবার মতো কিছু নাই। বছর কুড়ি মেয়েটির বয়স হইবে। আমি তাহার দিকে চাহিলাম, সে আমার দিকে চাহিল। তাহার কিছুমাত্র ভ্রূকুঞ্চন না দেখিয়া আমি যেন কেমন একটা লজ্জা অনুভব করিলাম। কিন্তু এত কাছাকাছি থাকিয়া কেমন করিয়াই বা কথা না বলি? অত্যন্ত বিসদৃশ অবস্থায় পড়িয়া গিয়াছি।

সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া এক সময়ে প্রশ্ন করিলাম, শরীর কি

খুব খারাপ মনে হচ্ছে আপনার ?

সে উত্তর দিল না, কিন্তু আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নির্ব্বোধ, নিরর্থক, সরল চাহনি। আমি অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া মুখ ফিরাইলাম। তবে কি সত্যিই ইহার মাথার দোষ আছে ?

রজনী তাহার হাত ধরিল। তারপর সস্নেহকণ্ঠে কহিল, শুনছ মলিনা, উনি জিজ্ঞেস করছেন—

দেখিতে দেখিতে মলিনার মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। ভিতরে তাহার কী যে যন্ত্রণা হইতেছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু তাহার মুখের অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইলাম।

বিকৃত মুখ আরও বিকৃত হইল। তারপর হঠাৎ চীৎকার করিয়া মলিনা বলিয়া উঠিল, থাকবে কি কিছু ? ছারখার হবে ; সর্ব্বনাশ হবে। যুদ্ধ করছি দিনরাত······মরুক, মরুক—

রজনী আমার দিকে চাহিয়া কহিল, দেখছেন ত ?

বলিলাম, এমন হয়েছে কতদিন থেকে ?

সে কিছুক্ষণ ভাবিল, তারপর কহিল, এটা থাকে না, সেরে যায়। কতদিন থেকে হয়েছে ? বলি।—খুব দুরবস্থার মধ্যে আমাদের কাটে সে ত আপনি বুঝতে পেরেছেন। মাস কয়েক আগে আমার ভালো একটা কাজের সুবিধে হয়েছিল, প্রায় ঠিক করেছিলুম, কিন্তু জনকয়েক লোকের চক্রান্তে ফস্‌কে গেল। সেই খবরটা শুনেই···এই যা দেখছেন, এই অবস্থাটা দাঁড়ালো।

'মিথ্যেবাদী, ডাকাত—'

চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু মলিনা চলন্ত গাড়ীর ভিতর অস্থির হইয়া চীৎকার করিল, 'কী খাইয়েছ তুমি আমাকে ?

আঃ কাট্‌লে কুচি কুচি ক'রে···জ্ব'লে গেল সব। তোমরা মরবে, আমার রক্তে বিষ মিশিয়ে দিলে···মরবে তোমরা, তোমাদের অনেক বাকি। মানুষ নেই, বিচার নেই,—তোমার ভালো হবে? কিছুতে না।'

'মলিনা?'

'য়্যাঁ?' বলিতে বলিতে মলিনা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। '—ওগো, আমি তোমাকে বলিনি, যদি ভালো হয় তোমারই হবে। আঃ জ্ব'লে গেল,—ওগো, কী যে যন্ত্রণা—'

আড়ষ্ট হইয়া আমি ইহাদের মাঝখানে বসিয়া রহিলাম।

রাস্তার পর রাস্তা পার হইয়া হাসপাতালের দরজায় আসিয়া পৌঁছিলাম। বেলা তখন চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। পাগলিনীর ঘনসান্নিধ্য হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিলাম। অফিসের কাজ ফেলিয়া আসিয়াছি, তবু আমাকেই সব ব্যবস্থা করিতে হইল। উভয়ের নাম রেজিষ্টারি করিয়া কর্তৃপক্ষ রোগিণীকে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। সৌভাগ্যবশত মলিনাদেবী চুপ করিয়াই রহিল।

তারপরে যে-পূজার যে-উপকরণ। পরীক্ষা, ঔষৎ, পথ্য, নার্সিং। আর কোনো ভয় নাই। রজনী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। নিয়মমতো প্রতিদিন বেলা পাঁচটা হইতে সাতটার মধ্যে একবার করিয়া দেখিয়া যাইবে।

বাহিরে আসিয়া কহিলাম, খুকি কোথায় আপনার?

রজনী কহিল, বাড়ীতে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। সন্ধ্যের পর যাবো। কিন্তু আপনাকে দয়া ক'রে এক-আধবার আসতে হবে, আপনার কাছে আমার কত-যে ঋণ—

বলিলাম, আপনি এখন কোন্ দিকে যাবেন?

সেই কাজটার তদ্বির করতে যাব; জানি হবে না, হতাশ হ'তে হবে, তবুও একবার যাই, বুঝলেন না? চাকরি নেই বলেই ত এত দুর্দ্দশা। উনি যদি শোনেন যে, ভালো কাজ একটা আমার হয়েছে তবে খুব স্বস্তি পাবেন। অভাব-অনটনের জন্যেই ত এই দুঃখ—

তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম, সে চলিয়া গেল।

পরদিন আমি আসিতে পারিলাম না, সম্পাদক মহাশয় অসুস্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহার কাজ আমাকেই করিতে হইল। রাত্রে বাসায় ফিবিয়া রজনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া খবর পাইয়াছিলাম, মলিনার অবস্থা একই রূপ, একবার নাকি ফিট্ হইয়াছিল।

আপনার চাকবির কি হোলো?

রজনী কহিল, কাগজ বিক্রী করতেই বারাকপুর পর্য্যন্ত যেতে হয়েছিল, আসবার গাড়ী ফেল্ করলুম, সুতরাং আজো বড় বাবুব দেখা পাইনি। কাল নিশ্চয়ই যাবো।

বলিলাম, আপনার ভাগ্য বিরূপ।

রজনী মাথা হেঁট করিয়া উপরে চলিয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যা নাগাদ আমি গিয়া হাসপাতালের দরজায় পৌঁছিলাম। লোকজন অনেক জড়ো হইয়াছে, তাহাদেরই ভিতরে দেখি রজনী ঘোরাঘুরি করিতেছে। সে আমাকেই খুঁজিতেছিল। দেখা পাইয়াই সে ছুটিয়া আসিয়া আমার

দুইটা হাত জড়াইয়া ধরিল। বলিলাম, খবর কি ?

কাঁদিতে সে পারিল না, ক্লিষ্ট ভগ্নকণ্ঠে সে কহিল, চাকরিটা হয়েছে আমার, তাই তাড়াতাড়ি খবর দিতে এসেছিলুম।

বলিলাম, খবর দেওয়া হয়েছে খুকীর মাকে ?

কা'কে খবর দেবো ? সকালবেলা সে মারা গেছে!

ভিতরে গিয়া খবর পাইলাম। একটি মরা শিশু প্রসব করিতে গিয়া প্রসূতি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। সেই অবস্থা আর কাটে নাই ; আজ সকালে হৃদস্পন্দন থামিয়া গেছে।

কী বলিব ? গরীবের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া কাঁদিব ? পথের লোকজন জড়ো করিয়া কি এই বক্তৃতা দিব যে, এই হতভাগ্য দুঃস্থের শোচনীয় মরণ ব্যর্থ হইবে না ? কালে কালে তিলে তিলে জাতির বুকে বিপ্লবের যে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ পুঞ্জীভূত হয়, এই মৃত্যু কি তাহাদেরই একটি ?

রজনীকে ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

*

* *

আশ্চর্য্য, জ্ঞানানন্দর মতো মানুষও সংসার পাতিল। বয়সে আমার চেয়ে সে বড়, ছোটবেলার গোবরগণেশ বলিয়া ক্ষ্যাপাইতাম। বয়সের পার্থক্য থাকিত না। একদিন শুনিলাম সে নাকি সন্ন্যাসী হইয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে, আর ফিরিবে

না। কোন্ গুরুর সহিত আশ্রমে আশ্রমে সে ঘুরিয়া বেড়ায়। আগে তাহার নাম ছিল প্রতাপ চাটুয্যে, এখন জ্ঞানানন্দ স্বামী।

স্ত্রী তাহার শক্ত-সমর্থ, আঁটসাঁট। শরীরে বেশ চর্ব্বি আছে, হাতের তাগা আঁটিয়া বসে। গায়ের রং কালো। নাম শ্যামাঙ্গিনী। শুনা যায়, একবার বাড়ীতে চোর পড়িয়াছিল, শ্যামাঙ্গিনী আঁষবঁটি লইয়া ছুটিয়া যান—সেই হইতে এ পাড়ায় আব চোর আসে না। ঘুমাইলে পাশেব বাড়ী হইতেও তাঁহার নাকডাকার শব্দ শুনা যায়, অথচ মশা-মাছির শব্দেই তাঁহার ঘুম ভাঙে। জ্ঞানানন্দর মতো অকর্ম্মণ্যকে যিনি চালনা করেন তাহার অসাধ্য কাজ নাই।

কেমন করিয়া ইহাদের দুইজনের বিবাহ হইল তাহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। জ্ঞানানন্দর মধ্যযুগের ইতিহাসটা আমার অজ্ঞাত; সেও ভাঙ্গে নাই, আমিও খোঁজ লই নাই। কিন্তু কিছুকাল হইতে তাহাদের পাশের ঘরখানা ভাড়া লইয়া অল্প অল্প করিয়া তাহাদের সংবাদ কানে আসিয়াছে। যে শ্যামাঙ্গিনীকে দেখিলে আমি ভয়ে ভয়ে ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিতাম, যাঁহার গলার আওয়াজ শুনিলে আঁৎকাইয়া উঠিতাম, তিনি যে এমন হইতে পারেন তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। পরস্ত্রীর প্রতি তাকাইবার একটা স্বাভাবিক কৌতূহল আছে পুরুষের; কিন্তু শ্যামাঙ্গিনীর দিকে আমি খুব মুখ তুলিতে পারিতাম না। তাঁহার মাথার চওড়া সিঁদুর যেন উচ্চকণ্ঠে আমাকে শাসন করিত; তাঁহার দোক্তা-খাওয়া মুখ, তাঁহার বাটনা-বাটা দুইটা

বলিষ্ঠ হাত, তাঁহার বড় বড় দুইটা শাণিত চোখ আমাকে দিনরাত্রি আড়ষ্ট করিয়া রাখে।

কত তাঁহার বয়স তাহা বুঝিবার উপায় নাই। পঁচিশ হইতে পারে, চল্লিশ বলিলেও অবিশ্বাস করিব না। শরীরের মাংসস্তূপের মধ্যে তাঁহার বয়স ইত্যাদি সমস্তই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তিনি পল্লীগ্রামের মেয়ে। ঘরে ঢেঁকি চালাইতেন, গরুর সেবা করিতেন, চাল কুটিতেন, মুড়ি ভাজিতেন। রাঙাপেড়ে শাড়ী পরিয়া গাছ-কোমর বাঁধিয়া তিনি দুই হাতে দুইটা বাল্‌তি লইয়া আজিও আমার ঘরের সুমুখ দিয়া যখন যান, আমি জানলার পাশে মুখ লুকাই! তিনি কোনো পুরুষকেই দেখিয়া লজ্জায় জড়োসড়ো হন্‌ না, সে অভ্যাস তাঁহার নাই। দিনের আলোয় তাঁহাকে দেখি তাই কিছু যায় আসে না; কিন্তু গভীর রাত্রে তাঁহাকে হঠাৎ কাছাকাছি দেখিলে নিশ্চয়ই ডরাইয়া উঠিব। একদিন তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আমার ঘরে বসিয়া গল্প করিবেন, সেদিন সকাল হইতে কাজের অছিলায় আমি নিরুদ্দেশ হইয়াছিলাম। আশ্চর্য্য, ইহাকেই লইয়া সন্ন্যাসী জ্ঞানানন্দ সংসার পাতিয়াছে। দুই তিনটি সন্তানও হইয়াছে; এক-আধজন আত্মীয়স্বজনকেও প্রতিপালন করিতে হয়।

'ওগো, ও ঠাকুরপো?'

আচমকা তাঁহার গলার আওয়াজে ভয় পাইলাম। বাহিরে আসিয়া কহিলাম, 'কি বলছেন?'

'তুমি কী চাকরি করো, শুনি?'

বলিলাম, 'একখানা দৈনিক কাগজের আপিসে···এই লেখালেখি করি আর কি।'

'আমার মাথা আর মুণ্ডু। মানুষে লেখাপড়া ছেড়েই ত চাকরি করতে যায়! এ মাসের দরুন টাকা দিয়েছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

শ্যামাঙ্গিনী কহিলেন, 'আমার গতরেই তোমার খাওয়া চল্‌ছে। আলাদা থাকতে গেলে আরো অন্তত তোমার পাঁচ-দশটাকা কোন্ না লাগতো?'

'সে তো বটেই বৌদি, আপনার অনুগ্রহেই—'

'বৌদি কি গা? আজকালকার বেহিসেবী চাল্! বৌদি, আভাদি, মায়াদি, ছায়াদি,—ওসব আবার কি ঢঙ? বৌ-দি-দি বলতে পারো না? ল্যাজ কাট্‌লে সন্দ হয়!'

এমন সময় ব্যস্তসমস্ত হইয়া জ্ঞানানন্দ বাহির হইয়া আসিল। কহিল, 'থাক্ থাক্, ওতেই হবে, আর কথায় কাজ নেই! টাকা দেয় বৈকি, ওকি আর অমনি আছে? ওহে, আর দাঁড়িয়ো না, তোমার অনেক কাজ।'—বলিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিয়া সে যাইতে বলিল।

আমি দ্রুতপদে পলাইয়া গেলাম। জ্ঞানানন্দ তাহার স্ত্রীর সান্নিধ্যে আমাকে থাকিতে দেয় না; এমন আঘাত করিয়া শ্যামাঙ্গিনী কথা বলিবেন যে, জ্ঞানানন্দের মুখ কালো হইয়া উঠিতে থাকিবে। মাসিক ভাতা দিয়া আমি ইঁহাদের সংসারে থাকি, বাধ্যবাধকতা কিছু নাই, তবুও স্ত্রীর দাপট হইতে জ্ঞানানন্দ আমাকে নিরন্তর রক্ষা করিয়া চলে।

একদিন শ্যামাঙ্গিনী কহিলেন, 'ঠাকুরপো, তোমার বিয়ে হয় না কেন গা?'

বলিলাম, 'অবস্থায় কুলিয়ে উঠতে পারিনি, বৌদিদি।'

তিনি কহিলেন, 'মেনি-মুখো পুরুষ তুমি, নইলে একটা মেয়েমানুষকে আর খাওয়াতে পারো না? দুগ্‌গা দুগ্‌গা, তোমাদের মুখ দেখলেও পাপ!'

'কি করব বলুন, যদি খাওয়াতে না পারি—'

'তুমি খাওয়াবার মালিক?'—শ্যামাঙ্গিনী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'কে কা'কে খাওয়ায় গা? এত অংখার কেন তোমাব? আবার ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা! মেয়েমানুষ খাটে তাই খায়,—পেটে ছেলে ধরে, বাসন মাজে, রাঁধে,—ঝাড়ু মারে তোমাদের দয়ায়। কুকুর বেড়ালের পেট তোমার, তাই এমন একালসেঁড়ে। পুরুষ না ছাই—'

জ্ঞানানন্দ কোথায় ছিল, দৌড়াইয়া আসিয়া আমাকে ধরিয়া ঘরের ভিতর পাঠাইয়া দিল, তারপর কহিল, 'কেন বিয়ে করবে না, নিশ্চয় করবে। ভালো মেয়ে পেলে ···দাও না তুমি একটা ওর বিয়ে?'

'পারিনে? খুব পারি। ভালো মেয়ের কি অভাব দেশে?'—শ্যামাঙ্গিনী কাছে আসিয়া কহিলেন, 'এই ত হাতের কাছেই রয়েছে আমার ছোট বোনটা—না হয় একটু ঝগড়াটে, কিন্তু তাই ব'লে কি,—তুমিই বলো দিকি?'

'বটেই ত, তাই তুমি ব্যবস্থা করো।'

শ্যামাঙ্গিনী চলিয়া যাইবার পর জ্ঞানানন্দ একবার বাহিরের

দিকে তাকাইয়া চুপি চুপি কহিল, 'একটা কি সুবিধে জানো, কিছু মনে রাখে না, সব ভুলে যায়!'

'কিন্তু ওঁর বোনের সঙ্গে যদি আমার সম্বন্ধ করেন, তাহ'লে—' ব্যাকুল হইয়া আমি জ্ঞানানন্দব দিকে চাহিলাম।

জ্ঞানানন্দ আমাব পিঠ চাপড়াইয়া হাসিয়া কহিল, 'পাগল, কিছু ভয় নেই!'

ভয় কিছু নাই সত্য, কিন্তু আমিও সাহস পাইলাম না। দুপুব বেলা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিবেই কাটাই, তবু সকাল হইতে দুপুব অবধি দুশ্চিন্তাব অন্ত থাকে না, কে জানে কখন্ তিনি আমাকে আক্রমণ কবিবেন। আমার প্রতি তাঁহার যে রাগ অথবা অভিযোগ আছে এমন মনে হয় না, তিনি আমাকে তাড়াইতে চান্ তাঁহাব ব্যবহাবে এমন আভাসও নাই, অথচ তাঁহার আওতায় আমি অস্থিব হইয়া উঠি। তবে কি বেশী করিয়া টাকা দিলে তাঁহাকে শান্ত রাখিতে পারিব? কই, আমাকে শোষণ করিবাব ঝোঁক ত তাঁহার দেখি নাই? আমি যেন একটা ভীষণ সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছি।

খাইতে বসিলাম। আদর নাই কিন্তু তাঁহার যত্ন আছে প্রচুর। তরকাবিব বাটিগুলি তিনি সাজাইয়া দিলেন। ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করিয়া খাইতেছি। কিন্তু একসময় তিনি হঠাৎ আমার থালার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ভাতের উপর ডাল ও তরকারি ছড়াইয়া দিয়া কহিলেন, 'অমন ক'রে জামাইয়ের মতন খায় না, এমনি ক'রে খেতে হয়। কিছু শেখোনি, একেবারে ষাঁড়ের গোবর।—তোমার আবার ওকি

ছাই খাওয়া ? আহা-হা, আদিখ্যেতা—'

জ্ঞানানন্দ তাড়াতাড়ি নিজের থালা গুছাইয়া লইল। অনেক লাঞ্ছনা তাহাকে সহিতে হয়, ইহা তাহার বোধ করি অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, বিবাদ বিতর্ক সে সযত্নে এড়াইয়া চলে। কিন্তু আমার সহ্য করিবার কোনো কারণ নাই,—কেন এ সংসারে আমি চোরের মতো হইয়া আছি ? কী অপরাধ করিয়াছি ? টাকা-পয়সা দিয়া কেন আমি অপরাধীর ন্যায় ভয়ে ভয়ে কাটাইব ? স্থির করিলাম ইহার প্রতিবিধান আমি করিব।

শ্যামাঙ্গিনী গোরুব জাব চট্‌কাইয়া দিলেন, আমি বাধ্য হইয়া তাহাই গোগ্রাসে খাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। আমার বয়স হইয়াছে তাই নিতান্ত কান্নাটা আসিল না।

আজই এখান হইতে চলিয়া যাইবার সুবিধা, আজ আমার ছুটি। ঘরে আসিয়া আমি জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিলাম। বাস্তবিক, আমি রগচটা মানুষ, কখন কি করিয়া ফেলিব তাহা জানি না, সুতরাং ভদ্রতা বাঁচাইয়া আমার পক্ষে স্থান ত্যাগ করাই মঙ্গল। কোথাও জায়গা না পাই বোর্ডিংয়ে গিয়া উঠিব। কলিকাতা শহরে টাকা ঢালিলে কী না হয় ! আমি দ্রুত হস্তে বিছানা ও কাপড়-চোপড় পাট করিতে লাগিলাম। এমন বেয়াদপ স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে থাকিলে আমার উন্নতি হইবে না। নির্ব্বোধ সন্ন্যাসী জ্ঞানানন্দ তাহার জাঁহাবাজ স্ত্রীকে লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকুক, সে চুলায় যাক্, আমি এখান হইতে সরিয়া পড়ি।

জুতাটা পায়ে দিয়া মুটে ডাকিবার জন্য বাহির হইতেছিলাম, এমন সময় দরজার কাছে শ্যামাঙ্গিনীর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল,—'অ ভালোমানুষের ছেলে?'

'আজ্ঞে' বলিয়া সবিনয়ে দরজার কাছে আসিলাম। দেখি তাঁহার হাতে এক বাটি দুধ। আমার পা কাঁপিতেছিল।

কহিলেন, 'এটুকু খেয়ে নাও দাদা, তখন দিতে ভুলে গেছি। এর মধ্যে চিনি আর কলা আছে।'

'কিন্তু দেখুন, আমি যে এইমাত্র—'

'আঃ ওই তোমাদের দোষ! এত ক'রে আনলুম, অমনি ঠ্যাকার! আমার হয়েছে যত জ্বালা, দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা! নাও, ধরো!'—বলিয়া শ্যামাঙ্গিনী বাটিটা একরূপ আমার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিলেন। আমি বাটি ধরিয়া চুমুক দিলাম, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে এই ভূত এখনই ছাড়াইব। অনেক হইয়াছে, আর না।

বাটিটা রাখিয়া বাহির হইতেছিলাম, তিনি রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন, 'বলি একবার এদিকে এসো দিকি ঠাকুরপো?'

ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি কহিলেন, 'তোমার ঘরখানা কি হরিঘোষের গোয়াল? এখানে কি মানুষ থাকে? এত জঞ্জাল?' বলিতে বলিতে তিনি ঘরে ঢুকিলেন।

'এসব কি? ময়লা জামা-কাপড়, বিছানা ওলোট-পালট, কুঁজোটা যাচ্ছে গড়াগড়ি, এত নোংরা। বাঁদী রেখেছ, কেমন? আমি কতদিক সামলাবো?'—চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঘরে যেন ডাকাত পড়িয়াছে।

মুখে কথা আসিতেছিল না, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।—তিনি কহিতে লাগিলেন, 'বর্ষাবাদল গেছে, জামা কাপড়গুলো ত রোদ্দুরে দিতে হয়। আহা, যেন মড়ার বিছানা, ঘরে কি আঁতুড় হয়েছিল? টান মেরে সব ফেলে দিতে হয়।' —এই বলিয়া কাপড়, জামা, বিছানা, বালিশ সমস্ত মোট করিয়া লইয়া তিনি উঠানের রৌদ্রে গিয়া ফেলিলেন। তারপর হাতে ঝাঁটা লইয়া তিনি যখন পুনরায় অবতীর্ণ হইলেন আমি গা ঢাকা দিলাম। কী জানি, তিনি সব করিতে পারেন।

আমার আর যাওয়া হইল না, পথে পথে রৌদ্রে ঘণ্টা দুই ঘুরিয়া আসিয়া যখন ঘরে ঢুকিলাম, দেখি শয়ন-মন্দিরের চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে, শ্রী ফিরিয়াছে। চারিদিকে দেখিয়া একটু যেন আনন্দ হইল।

জ্ঞানানন্দ দিবানিদ্রা দিয়া আমার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, 'দুর্যোগ কেটে গেছে ত? শুয়ে শুয়ে সব শুনছিলুম।'

হাসিয়া কহিলাম, 'তোমার ভাগ্যটা ঠিক ঠাওরাতে পাচ্ছিনে, ভালো কি মন্দ!'

জ্ঞানানন্দ হাসিল। কহিল, 'প্রতিবাদ ক'রো না, যা বলে চুপ ক'রে শুনে যেয়ো, সাড়াশব্দ ক'রো না।'

বলিলাম, 'তোমার গা-সওয়া হয়ে গেছে, কেমন?'

জ্ঞানানন্দ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর আমার তক্তার উপর গা এলাইয়া দিয়া কহিল, 'কিন্তু ভালো লাগে হে।'

নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, 'যার ভালো তারই ভালোই। কি জানি, কিছুই বুঝিনে।'

জ্ঞানানন্দর মুখে আবার হাসি ফুটিল। তাহাকে কোনো কিছুতেই চঞ্চল হইতে দেখি নাই। কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া কহিল, 'তোমার বিপদ এই যে, উনি তোমাকে পর মনে করেন না।'

ছুটির দিনে কাহারও কোনো তাড়া নাই। বাহিরে শ্যামাঙ্গিনী বাসন মাজিতেছেন, ঘর ধুইতেছেন। ঘরের ভিতরে আমরা দুই বন্ধুতে বসিয়া নানা গল্পগুজব করিতেছিলাম।

বলিলাম, 'আশ্রমে আশ্রমে না ঘুরে এ বরং তুমি ভালোই করেছ। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, সংসার।'

জ্ঞানানন্দ আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি পুনরায় কহিলাম, 'নিশ্চয়ই, বিয়ে মানে স্থিতি, প্রতিষ্ঠা, সম্মান। বিয়ে না করলে বেঁচে থাকার নিগূঢ় কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওয়া কঠিন।'

এইবার জ্ঞানানন্দ হাসিয়া কহিল, 'ওহে, সন্নিসি মানুষ, তবু আমার কাছে একটা গল্প আছে। দেখো, যেন কোথাও প্রকাশ ক'রো না, বড় লজ্জা পাবো।'

বলিলাম, 'প্রেমের গল্প যদি হয় তবে খুব সংক্ষেপে সারবে, এই অনুরোধ।'

'হ্যাঁ, প্রেমেরই গল্প, এবং গল্পটাও খুব সংক্ষিপ্ত। সংসারে নিত্য যা ঘটে তারই একটা পরিচ্ছেদ। সেই অতি পুরাতন কাহিনী।'

বলিলাম, 'রঙ আর রস বাদ দিয়ে কেবল স্থূল ঘটনাটা বলো।'

'তাই বল্‌ব, কিন্তু সাবধান।' বলিয়া জ্ঞানানন্দ বাহিরের

দিকে একবার তাকাইয়া চুপি চুপি কহিল, 'তোমার বৌদিদির পায়ের শব্দ হলেই আমাকে ইশারা করে দিয়ো। শোনো তবে গল্পটা।'

ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, 'ভূমিকা আছে নাকি?'

জ্ঞানানন্দ কহিল, 'মোটে না, শোনো। হ্যাঁ, সেই চিরন্তন কৌতুক। একটি মেয়েকে নিয়ে বাধলো গণ্ডগোল, তখন আমার সন্ন্যাসের প্রথম অবস্থা। বিষয়বিরাগী, কামিনী-কাঞ্চন মোহশূন্য, কী লজ্জা আমার, কী সন্ত্রাস! এদিকে সেই ভালোবাসা, সেই হৃদয়াবেগ, আর মান-অভিমানের পালা, সেই দেখা-দেওয়া আর দেখা-না-পাওয়া। ওদিকে সামাজিক কৌতূহল আর কানাকানি।'

বলিলাম, 'তখন কি গেরুয়া পরতে?'

'না, তবে গায়ে জামা দিইনে, চাদব জড়িয়ে থাকি। গুরুর কাছে আনাগোনা করি, ধর্ম্মগ্রন্থ পড়ি। হা ভগবান, মেয়েটি পথে এসে দাঁড়ালো, পথ ছাড়ে না।'

'কী বলে?'

'কাঁদে!'

বলিলাম, 'কাঁদে কেবল?'

জ্ঞানানন্দ কহিল, 'তার ইচ্ছে আমি তাকে মন্ত্র দিই। সংসার সে চায় না, মেয়েমানুষের সাধারণ কাম্য তার কিছুই নেই, সে চায় না ভালবাসা। অদ্ভুত তার চরিত্র!'

তাহার মুখের দিকে তাকাইলাম। ভাবিলাম, ভালোবাসা চায় না, এমন মেয়ে ত সংসারে নেই।

সে বলিতে লাগিল, 'কী সংগ্রাম। আমরা মিলতে চাইনি, পরস্পরকে এড়াতে চেয়েছি। দুঃখ দেবো না, দুঃখ নেবো না। অথচ দেখি আমাদের সব চেষ্টা মিথ্যে হয়ে যায়। আমি পালাই, সে পিছু ছোটে ; সে পালায়, আমি তার সন্ধানে ফিরি। এমনি ক'রে কাটে দীর্ঘকাল।'

'কী মন্ত্র দেবো তাকে ? কী জানি আমি ? আমি অজ্ঞান, সে অন্ধ। পথে দাঁড়িয়ে সে কাঁদে, আমি পথ দিয়ে চ'লে যাই। আশ্চর্য্য, আমার মতো নিষ্কর্ম্মা, আমার মতো দায়িত্বজ্ঞানশূন্য—তার বোঝা মাথায় নেবার সাধ্য কোথায় আমার ?'

'সে এক জটিল সমস্যা। মেয়েটা ছাড়লে তার আত্মীয়-পরিজন, মাথায় তুলে নিলে কলঙ্ক আর অভিসম্পাত, লোকের দরজায় দরজায় আশ্রয় নিয়ে বেড়ায়। জানো তুমি, মেয়েদের সম্মান কেমন পদে পদে বিপন্ন হয় ? গৌরব করব না, কিন্তু সে সমস্তই আমার জন্যে। তাকে ছাড়তেও পারিনে, ধরতেও পারিনে।'

বলিলাম, 'তারপর ?'

জ্ঞানানন্দ হা হা করিয়া হাসিল। কহিল 'প্রেম নয় হে, কঠিন শাস্তি। এমন মেয়ে দু'চারটি থাকলে কী ভীষণ বিপদ বলো ত ? জগতের সমগ্র পুরুষ জাতি বিপন্ন হবে।'

'মেয়েটি কেমন তাই বলো।'

'চমৎকার। দয়া, ক্ষমা, সহনশীলতা,—এমন মেয়ে হিন্দুঘরেই জন্মায়। মধুর তার ব্যবহার, প্রসন্ন মন, প্রাণের রসে সে টলোমলো। চরিত্রের এমন লাবণ্য জীবনে দেখিনি ; বনের

পশুও বশীভূত হয়। কি জানো, ভালোবাসাটাই সংসারে বড় নয়, তার সঙ্গে থাকবে গভীর কল্যাণবোধ। মেয়ে-পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ যেটা সেটা নিত্যবস্তু, কিন্তু তার শ্রী ফুটে ওঠে সেবায়, সংযমে।'

বলিলাম, 'জ্ঞানানন্দ, আমি দৈনিক কাগজে চাকরি করি, ওগুলো প্রতিদিন লিখি। দার্শনিকতা বাদ দিয়ে গল্পটা ব'লে যাও।'

জ্ঞানানন্দ হাসিল, বলিল, 'গল্পটার পরিণতি কেমন হ'লে তোমার ভালো লাগে?'

তাহাব মুখের দিকে চাহিয়া কহিলাম, 'হেঁয়ালি ক'রো না জ্ঞানানন্দ, বলে যাও।'

জ্ঞানানন্দ দমিল না। কহিল, 'এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেমন লাগল তোমার মেয়েটিকে?'

বলিলাম, 'রাহুর প্রেম। তোমার ঘাড়ে প'ড়ে তোমাকে গিলে খেতে চায়। যতই বলো, এসব মেয়ে বিপজ্জনক।'

জ্ঞানানন্দ চুপ কবিয়া নিজের মনে হাসিতে লাগিল। আমি পুনরায় কহিলাম, 'যাক্ গে, সর্ব্বনাশীকে ছাড়ালে কি কৌশলে তাই বলো।'

এমন সময় দরজার কাছে পায়ের শব্দ হইল। দুই পেয়ালা চা হাতে লইয়া শ্যামাঙ্গিনী ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, ঘরের শত্তুর বিভীষণ। ছাড়েনি গো ছাড়েনি, সব মেয়েকে ছাড়ানো যায় না।' বলিয়া চায়ের পেয়ালা দুইটি রাখিয়া তাঁহার দোক্তা-খাওয়া মুখে দাঁতের মাড়ি বাহির করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আড়ালে দাঁড়াইয়া তিনি শেষের কথাগুলি শুনিয়াছেন।



ছয়মাস জ্ঞানানন্দর বাসায় থাকিয়া নূতন বাসায় পলাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখানে আসিয়া এক জটিল জীবনের সাক্ষাৎ পাইলাম।

আমার নির্লিপ্ত জীবনযাত্রাটা আশেপাশে অনেকেরই ভাল লাগিয়াছে; বিশেষ আমি যাহাদের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছি, এখানে কেবল তাহাদের কথাই বলিব। একজনের নাম মানদা, অন্যজনের নাম নলিনী। মানদা-নলিনী-সংবাদ এ পাড়ার প্রায় সবাই জানে। ঘরে বসিয়া থাকিলেও তাহাদের উচ্চ কণ্ঠের কোলাহল আমার ঘরটিকে সর্ব্বক্ষণই মুখর করিয়া রাখে। পারিপার্শ্বিক সংসর্গটা এখানে খুব ভাল নয়।

সামান্য কথা লইয়া বিবাদ। যেখানে আত্মীয়তা-বোধ নাই সেখানে নগণ্য ত্রুটি লইয়াও বচসা বাধিয়া যায়।

মানদা কহিল, 'শুতে পারিসনে আলাদা? তোর ঘর নেই? নিজের বেলা আঁটিসুঁটি!'

নলিনী কহিল, 'ভারি জায়গা তোমার; পাছতলায় ত' পড়ে থাকি; না একখানা মাদুর, না একটা বালিশ। ঘর আমারো আছে, দেশে গেলে পায়ের ওপর পা দিয়ে—'

'তাই যা না, মরতে কেন আসিস আমার ঘরে? ডাইনী কোথাকার! খবরদার, তুই আমার ছেলের গায়ে হাত দিবিনে আজ থেকে, বলে রাখলুম।'

নলিনী চেঁচাইয়া উঠিল,—'লম্বা লম্বা কথা। কে চায়

তোমার ছেলেকে ? আমার ঘরে আসে কেন ? কেন যখন-তখন নোংরা ক'রে যায় ? কিছু বলিনে তাই !'

মানদাও তাহার জবাব দিল, কহিল, 'বল্‌বি কি লা ? কোম্পানীর রাজত্ব, ব'লে পার পাবি ? দিনের বেলা বাওচাল্লি, রাতের বেলা মর্‌তে আসিস কেন আমার আঁচলের তলায় ? অত যদি ভূতের ভয়, ঘরভাড়া নিলি কেন ? ভূত, তুই ত ভূত একটা, ভূত তোর ইয়ে—

'মুখ সামলে কথা ব'লো মানদাদি, ভাল হবে না কিন্তু—বলিয়া নলিনী শাসন করিয়া দিল। কহিল, অমনি থাকতে দাও, কেমন ? দু' দুটো ছেলে তোমার হাসপাতালে যখন কাজ করতে যায়, কে রাখে তোমার ছেলেকে ? বাসন মেজে দিইনে ? দু' আনা, এক আনা নাওনা যখন-তখন ? রাতে একটু কাছে শুই ব'লে আবার চোখরাঙানি !'

মানদা কহিল, 'অম্‌নি করিস, কেমন ? রাঁধে কে, শুনি ? খাসনে তুই আমার গতরে ? এক হাঁড়ি ভাত পর্য্যন্ত নামাতে জানিসনে, মেজাজ দেখাতে এসেছিস !'

নলিনী গর গর করিতে লাগিল। নিজের ঘরে গিয়া নিজের মনেই বকিতে লাগিল,—রান্নার আবার খোঁটা দেয় ! কী না করি, ওর কুকুরটাকে আমি খেতে দিইনে ? ওর ছেলের ঝি-গিরি করিনে ? লম্বা লম্বা কথা ! থাক্‌ব না, কিছুতে থাক্‌ব না, অমন ছোটলোকের সঙ্গে—

ওধার হইতে মানদা গর গর করিতেছিল,—'মুখ খ'সে যাবে, ও তেজ থাকবে না ! বুকে ক'রে ওকে সামলে রেখেছি ! বলি,

আহা, সোমত্ত বয়েস, কোথায় কোন্ বিপদে পড়বে, থাক্ আমার কাছে। যা না, কোথায় যাবি! আমিও দেখ্‌ব, যদি বেনের মেয়ে হই, কে তোর মাথা রাখে ছাতা দিয়ে!'

'ভারি দেখ্‌ছ তুমি, বেনোজল ঢুকিয়ে বেড়াজল টান্‌ছ ব'সে ব'সে; কায়েতের মেয়েকে শুষে খাচ্ছ। তোমাকে যেন আর আমি চিনিনে?'

এমন সময় আসিয়া ইহাদের মাঝখানে দাঁড়াইলাম। হাসিয়া কহিলাম, 'থালা-বাটি বুঝি একসঙ্গে থাকবার জো নেই, কেমন? এ-বেলা কি নিয়ে লাগল, ও মানদাবাবু?'

মানদার হইয়া নলিনী বাহির হইয়া আসিল। কহিল, 'এ-বেলা লাগ্‌ল আপনার মাথা নিয়ে।'

বলিলাম, 'মাথার দাম আছে গো, দৈনিক কাগজে চাকরি করি। রাজনীতি থেকে আরম্ভ ক'রে বস্তিসাহিত্য পর্য্যন্ত লিখতে পারি।'

নলিনী কহিল, 'পারবেন বৈকি, শেষেরটাই আপনার হাতে মানাবে ভালো।'

ভারি লজ্জিত হইলাম। নলিনী কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহিবার মেয়ে নয়। খোঁচা দিয়া কথা না বলিলে তাহার কথা বলাই হয় না। বলিলাম, 'রাগ করলেই ভাত বেশী খেতে হবে, অত চটো কেন? নলিনীবাবু, তুমি বড় রগচটা!'

নলিনী কহিল, 'দেখুন না, যখন-তখন রান্নার খোঁটা দেয়। আমি বুঝি গতর খাটাইনে? মাস মাস টাকা ঢাল্‌ছি কিসের জন্যে? ওর ছেলের ঝি-গিরি ক'রে আমার হাড় কালি হ'ল,

দেখ্‌তে পায় না ?'

মানদা ছুটিয়া আসিল কহিল, 'ঠাকুরপো, জিজ্ঞেস কর দিকি আমার ছেলে ধরতে কে বলে ওকে ? ছোট ছেলে, ওদের কি জ্ঞান-গম্যি আছে ? মাসি ব'লে ছুটে যায়। তাড়িয়ে দিলেই ত' পারিস ?'

নলিনী কহিল, 'তাড়িয়ে দেবো, শোনে কিনা আমার কথা ? এত মারি-ধরি, তবুও কাছছাড়া হয় না। আমি কি ডাক্‌তে যাই ? পরের ছেলের ওপর অত দরদ আমার নেই।'

বলিলাম, 'বটেই ত, কেন থাক্‌বে, মিথ্যে কথা।'

মানদা হাত উঁচু করিয়া শাসন করিয়া কহিল, 'আজ থেকে যদি আমার ছেলে তোর কাছে যায় তবে ওদের মেরে খুন করব।'

'মেরো, খুব মেরো, খুন ক'রো, আমার তাতে কি ? জ্ঞাত নয়, জ্ঞাত নয়, রাস্তার লোক ! মারলেই অমনি হয় না, পুলিশ আছে, বিচার আছে।'—বলিয়া নলিনী ঘরের ভিতর ঢুকিল।

মানদা কহিল, 'বেশ করব, খুন করব, ছেলে আমার, আমি ওদের পেটে ধরেছি।' এই বলিয়া সেও রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। দুইজনের রাগ আর পড়িতে চায় না।

ঘরের ভিতর হইতে আমাকে শুনাইয়া নলিনী কহিল, 'খুন ক'রে আদালতে গিয়ে ব'লো, তারা সন্দেশ খেতে দেবে !'

ইহারা দুইজনেই ভদ্রঘরের মেয়ে, সে কথাটা ইহারা দুই-জনেই মাঝে মাঝে কেন যে ভুলিয়া যায়, তাহা বলিতে পারি না। সম্ভবত ভাষার চেহারা বদ্‌লাইয়া এমন কলহ অভিজাত

সমাজেও হইয়া থাকে, তবে প্রকাশটা হয়ত কিছু সংযত। ঝগড়া থামাইতে আসিয়াই ইহাদের সহিত আমার আলাপ হয়, সেই আলাপ হইতেই ঘনিষ্ঠতা। সকালবেলা কোনদিন নলিনী আসিয়া ঠাকুরের প্রসাদ আমাকে খাইতে দিয়া যায়, কোনো-দিন মানদার হাতে পাই আলুর চপ অথবা ইলিশ মাছ ভাজা। আমি ভালই আছি।

মানদার স্বামী আছে, সে লোকটি কোন্ এক কোম্পানীর হইয়া সুগন্ধী তেল ও সাবান বিক্রয় করিতে মফঃস্বলে যায় এবং একবার গেলে পনেরো কুড়িদিন বাড়ী ফিরে না। তাহার উপার্জ্জন সামান্য। মানদাও বসিয়া থাকে না, কোনো এক লেডি-ডাক্তারকে ধরিয়া প্রসূতি পরিচর্য্যা করিয়া সামান্য কিছু কিছু আনে। দুইটা ছেলে হইয়াছে। নলিনী ইহাদের মধ্যে আসিয়া অনেকদিন ধরিয়াই আছে। সে কায়স্থ ঘরের কন্যা, তাহার কে আছে এবং কে নাই, কেনই বা এখানে আসিল, এখানে থাকিবার তাহার কি প্রয়োজন—আমি ইহার কিছুই জানি না। কেবল এইটুকু জানি, সে এখানেই কোন্ একটা মেয়ে-ইস্কুলে ছোট ছোট বালিকাদের তত্ত্বাবধান করিতে যায়। সারাদিন সেখানে থাকে, বিকালবেলায় বোর্ডিংয়ে কি একটা কাজে যায়। মাসে চল্লিশটি টাকা সে উপার্জ্জন করে। তাহার চেহারায় শ্রী না থাক্, স্বাস্থ্যটা আছে অটুট।

ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় নলিনী বাহির হইয়া আসিল। আমি বলিলাম, 'ওকি, খেয়ে গেলে না যে নলিনীবাবু!'

নলিনী বলিল, 'না, ওর হাতের রান্না…এই আমি দিব্যি

করলুম'—বলিয়া বাহির হইয়া সে স্কুলে চলিয়া গেল।

বাহির হইয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় মানদা আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, 'যুদ্ধের ঘোড়া, দেখলে ত ঠাকুরপো! আমি বলি, যা তোর যেখানে খুশি, এটা ত আমার হোটেল নয় যে যাকে-তাকে ঘরে রাখব। ছেলে ছুটোকে বশ করেছে।'

বলিলাম, 'তোমার ছেলে ছুটোও যে ওকে ছেড়ে থাকতে পারে না। সেদিন সন্ধ্যেবেলা মাসি ফেরেনি ব'লে কান্না নিয়েছিল।'

মানদা কি যেন কিয়ৎক্ষণ ভাবিল, তারপর কহিল, 'তেজ ক'রে না খেয়ে গেল, বয়সের গরম! কার ওপর রাগ করিস শুনি? নিজের পয়সায় নিজে খাবি···তোর টাকায় ত আর আমার সংসারের সাহায্য হয় না।'

বলিলাম, 'একটু যদি মানিয়ে বনিয়ে চলা যায়—'

'কেমন ক'রে চল্‌বে, মেজাজ যে ঠাণ্ডা নয়! রাগটাই বড়, রাগ ওর সকলের ওপর। সেদিন আমার ছেলেটাকে মেরে আধমরা করলে।'

'তাই নাকি, তুমি কিছু বললে না মানদাবাবু?'—বলিয়া হাসিলাম।

মানদা কহিল, 'বলব? ওরে বাবা, ওর কাজের ওপর কথা বললে আমার মাথা থাকবে? ছেলেটাও যে ওর আঁচল-ধরা ঠাকুরপো। অত মার খেয়েও দেখি ওরই কোলে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়লো। ডাইনীর হাত থেকে ছেলে ছুটো আমার বাঁচলে হয়—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ছুটির দিনে সন্ধ্যাবেলা নিজের ঘরে বসিয়া লিখিতেছি, এমন সময় নলিনী আসিয়া আমার ঘরে ঢুকিল, সাড়া দিয়া কুণ্ঠিত হইয়া লোকের ঘরে ঢুকিবার বদ্ অভ্যাস তাহার নাই, তাহার আবির্ভাবের ভিতরে যেন আক্রমণের ভাবটাই প্রবল। উঠিয়া বসিলাম,—'এমন অসময়ে যে নলিনীবাবু?'

সে কহিল, 'আমার অসময় নয়। খাঁচায় ঢোকবার আগে একবার আপনার শ্রীচরণ দর্শনে এলুম। আপনার ঘরটি বেশ ভালো।'

'কেন?'

'বই-কাগজের গন্ধ। দেশ-দেশান্তরের খবর আপনার ঘরে ঘুরে বেড়ায়। আপনার সুখের জীবন।'

হাসিয়া বলিলাম, 'নদীর এপার বলে, ওপার ভালো।'

নলিনী আমার ঘরের চারিদিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি বুলাইতে লাগিল, তাহার পর কহিল, 'আমারও ইচ্ছে ছিল খুব লেখাপড়া শিখি। হ'ল না। যাকে খেটে খেতে হবে তার আবার অত সখ কেন?'

বলিলাম, 'নলিনীবাবু, লেখাপড়া শিখেও ত উপার্জ্জন করা যায়।'

'নাঃ, অনেক শিখে যা পাবো, পরিশ্রম ক'রেও আমি তাই পাবো। লেখাপড়া করবার সময় নেই, পেট চলবে না—'বলিয়া নলিনী ম্লান হাসি হাসিল।

বলিলাম, 'যাই বলো, তুমি একটু বদরাগী, কেমন না?'

'তা হবে।'—নলিনী কহিল, 'বল্‌ব না? আমাকে ফাঁকি

দিতে আসে কেন? ভারি শয়তান, এই আপনাকে ব'লে রাখলুম। কি করে—শুনবেন? মাসকাবারে টাকা নেয় আমার কাছে আদায় ক'রে, খেতে দেয় ছাই-ভস্ম। রুক্ষু ডাল, দুখানা আলু আর সরষের তেল, এই ত খাই। চালের মণ সাড়ে ষোল টাকা; দশ সেরের বেশী চাল খাইনে। আটাশ টাকার হিসাব দিন্ ত? তা ছাড়া আট টাকা ঘরভাড়া।'—বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছল-ছল করিয়া উঠিল।

বলিলাম, 'অন্য জায়গায় তোমার বুঝি যাবার কোনো সুবিধে নেই?'

আমার কথার উত্তর সে দিল না। কহিল, 'একখানা ভাল কাপড় কি ওর জন্যে থাকবার যো আছে? ভালো জামা, ভালো শাড়ী সব প'রে-প'রে উনি যাবেন কাজ করতে। কা'র না কা'র নোংরা, আমি কি আবার সে সব ফিরিয়ে নিতে পারি? আমার জন্যে ওর জামা-কাপড়ের খরচ বাঁচে। বড় শঠ মেয়েমানুষ, বুঝলেন?'

বলিলাম, 'তুমি পাও চল্লিশ টাকা, এত ভালো জামা-কাপড় তুমি কোথা থেকে—?'

'গান গাই যে!'—নলিনী কহিল, 'বোর্ডিংয়ের মেয়েদের গান শোনাই, তারা খুশী হয়ে আমাকে দেয়। ওমা, তারা সব বড় বড় ঘরের মেয়ে! ও কোথায় কি পাবে? দুদিন খাটলে তবে পায় দুটো টাকা'—চুপি চুপি সে পুনরায় কহিল, 'একদিন কার বাড়ী থেকে যেন একটা সেমিজ চুরি ক'রে এনেছিল, তারা আর বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেয়নি!'—বলিয়া সে যেন পরম আনন্দে

হাসিতে লাগিল।

তাহার হিংস্র হাসি দেখিয়া আমি কহিলাম, 'যার এত নিন্দে করছ সে ত তোমাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে, নলিনীবাবু।'

'নিন্দে এর নাম? এর কোন্‌টা মিথ্যে বলুন ত? সব সত্যি, আপনাকে দিব্যি ক'রে বলছি। হ্যাঁ, আশ্রয় আমাকে দিয়েছে বটে, সে ত নিজের সুবিধের জন্যে।'

বলিলাম, 'তুমি তার জন্য উপকৃত।'

নলিনী কহিল, 'যদি তাড়িয়ে দেয়, চলে যাবো। জায়গার কি অভাব? তা ছাড়া—'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তা ছাড়া কি?'

বাতির আলোর দিকে চাহিয়া সে ম্লান হাসিয়া কহিল, 'আমার জীবনের দাম নেই। বোঁটা থেকে খ'সে পড়েছি। উড়ে উড়েই ত বেড়াতে হবে।'

বলিলাম, 'কি জানো নলিনীবাবু, এমনি ক'রে দিনের পর দিন নোংরা ঘাঁটলে মন ছোট হয়ে যায়।'

'হোক্ না ছোট, দেখি না কত দূর।'

ইহার পরে আর কথা চলে না, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু নলিনী চুপ করিয়া ছিল না, মনে মনে সে যেন কী কথা ভাবিতেছিল। এক সময় কহিল, 'কথায় কথায় আমাকে খোঁটা দেয়, বলে, তুই থাকিস কেন! আরে আমি থাক্‌লে তোর সম্মান বাড়ে যে, আমি ভদ্র ঘরের মেয়ে। জানি অনেক নীচে নেমে গেছি, তবু ত জাতসাপের বাচ্চা। আর তুই? জানিনে বুঝি তোর কিছু? বলতে গেলে অনেক কথা,—বুঝলেন?'

অনেক কথা আমার শুনিবার কোনো কৌতূহল ছিল না তাহা নলিনী বুঝিল। সে কহিল, 'বেঁধে রেখেছে কিনা তাই সহজে—'

বলিলাম, 'কে বেঁধে রাখ্‌ল তোমাকে ?'

'শত্তুরে! আর জন্মের দেনা। শেকল ছিঁড়ব যেদিন, বুঝবে। মায়া-দয়ার মাথায় ঝাড়ু। কার জন্যে কার আটকায় বলুন ত ?—নলিনী কহিল, যার চাল-চুলো নেই, আপন-পর নেই, সে আবার বাঁধন মান্‌বে কেন ? আমি ওসব পরোয়া করিনে।'

বলিলাম, 'নলিনীবাবু, তোমার আত্মীয় এখানে কে কে আছেন ?'

'আত্মীয়!'—নলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, 'সবাই আমার আপন,—আচ্ছা, আজ উঠলুম।'

বলিলাম, 'হাতে তোমার কী, লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছ যে ?'

নলিনী কহিল, 'বাবারে কী সন্দেহ! আপনার ঘরের কিছু নয় গো মশাই—'

'না না, তা বলিনি। আমি হাসিলাম।

'এ দুটো জাপানী খেল্‌না।—বলিয়া সে দুইটা কাগজের বাক্স দেখাইল।

বলিলাম, 'খেল্‌না ? কা'র জন্যে ?'

নলিনী হাসিয়া কহিল, 'এটা মোটর গাড়ী, আর এটা রেলগাড়ী!'—এই বলিয়া সে আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বুঝিলাম শৃঙ্খলটা তাহার কোথায়, কোথায় সে বাঁধন

মানিয়া চলিতেছে। বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয় বোধ করি এমনি করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

আমি ইহাদের নিয়মিত খোঁজ-খবর লই না, লইবার কথাও নয়, এবং তাহার অধিকারও আমার নাই। মেয়েমহলে ঘুরিয়া স্নেহ আদায় করিয়া বেড়ানো আমার পেশা নয়। মাঝে মাঝে মনে হয় দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এপাড়ায় আসিয়া পড়িয়াছি, দিবা-রাত্র বিশ্রী কলহ শুনিয়া শুনিয়া সত্যই আমিও যেন ছোট হইয়া যাইতেছি। পুরুষের তত্ত্বাবধানে না থাকিলে মেয়েরা অতি সহজেই পরস্পরকে নখরাঘাত করে।

সে দিন সকাল বেলা ইহাদের ভিতরে আবার একটা প্রবল গণ্ডগোল বাধিল। সামান্য কলের জল লইয়া ঝগড়া। তাহার পরে শুনিতে পাইলাম, বড় ছেলেটা রান্নাঘরে কি যেন অপাট করিয়াছে, মানদা তাহাকে প্রহার করিতে আসিল, নলিনী দিল বাধা। ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন অকারণে ইহাদের অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে থাকে, সুযোগ পাইলেই গল গল করিয়া বাহির হয়।

মানদা কহিল, 'মা'র পোড়ে না, পোড়ে মাসির—'

নলিনী কহিল, 'পুড়ে ত ছাই হ'ল। মারো না, মেরে একবার মজাটা ছাখো। মানার ওপর ঝাল, কেমন?'

'ঝাল নয়? কোন্ আঁস্তাকুড়ে ঠাঁই পেয়েছিলি? মরতে এলি কেন আমার ঘর জ্বালাতে? ওরে বাবারে, বাবা কালকুটে মেয়েমানুষ।'

'তুমি কম, কেমন? তুমি আঁস্তাকুড় মাড়িয়ে বেড়াও নি?

মাথায় সিঁদুর মেখে এখন গেরস্থালী করতে এসেছ,—সাবধান, আমাকে ঘাঁটিও না, এখুনি ধুড়ধুড়ি নেড়ে দেবো।'

ঝঙ্কার দিয়া মানদা কহিল, 'আস্কারা দিয়ে ছেলে-দুটোকে নষ্ট করতে চাস কেন লা? কথায় কথায় শাসন! তোর খাই না পরি? সোয়ামী-পুত্তুর নিয়ে ঘর করি, তোর মতন উড়নচুড়ে? কই, তাকে বেঁধে রাখতে পাল্লি? কি খ্যামতা তোর? না রূপ, না গুণ! চ'লে ত গেল লাথি মেরে। আবার কথায় কথায় বলে, ধুড়িধুড়ি নেড়ে দেব!'

হঠাৎ একটা দাপাদাপির শব্দ পাইলাম, তাহার পরেই বড় ছেলেটা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে মানদাও গর্জ্জন করিল, 'মারলি আমার ছেলেকে, এত বড় আস্পদ্দা? এখুনি পুলিশ ডাক্‌ব, হাতকড়া দিক্ এসে।—ওগো কে কোথায় আছ—'

দ্রুতপদে গিয়া তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইলাম। মানদা কহিল, 'ঠাকুরপো, ওর হাত দুখানা বাঁধো। সাধে বলি, খুনে মেয়েমানুষ!'

ছোট দুইটা ছেলে 'মাসি মাসি' বলিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছিল। মানদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কহিল, 'খুন করলে আমার ছেলেকে। করবেই ত। ও যে নষ্ট-দুষ্টু, ওর কি মায়া-দয়া আছে? তুমি এর হেস্তনেস্ত কর ঠাকুরপো, আমি ছাড়ব না। ওর রাগের আমি কি ধার ধারি, তুমিই বলো দিকি?'

দুমদাম করিয়া নলিনী ঘরের ভিতর জিনিসপত্র ওলট-পালট

করিতেছিল। নিজের ঘর আজ সে নিজেই ছারখার করিবে। তাহার আক্রোশ পৃথিবীর সকলের উপর।

বলিলাম, 'কেন এই রাগারাগি ?'

'ও যে পাগল, মরিয়া ;'—মানদা কহিল, 'এসেছিলি কেন মরতে দেশ থেকে পালিয়ে ? ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বল্ দিকি তোর কু-মতলব ছিল কিনা ? ভদ্দলোকের ছেলেকে টেনে আন্‌লি, তোর বেহায়াপনা সে সইবে কেন ? আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল।—ও ঠাকুরপো, ওই ছাখো আমার ঘরদোর সব ভাঙলে, ভাল হবে না কিন্তু—'

এখান হইতে ডাকিলাম, 'নলিনী !'

নলিনী উন্মাদিনীর মতো বাহির হইয়া আসিল। তখনও তাহার চক্ষু জ্বলন্ত আক্রোশে ধকধক করিতেছিল। কাপড় আলুথালু, চুলের রাশ এলোমেলো। উপর দিকে চাহিয়া সে বিদীর্ণ কণ্ঠে কহিল, 'তুমি জানো ঠাকুর, সব মিথ্যে, সমস্ত মিথ্যে, যা সবাই জানে তার একটুও সত্যি নয়। যাক, সব ভাঙুক, সব ছারখার হোক।' বলিতে বলিতে সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'অপমান কল্লে মানদা দিদি, আর থাকব না আমি তোমার কাছে, আর দেখব না তোমাকে এ জীবনে।'

যেন একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণায় তাহার হৃদয়ের ভিতরে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাহাকে বাধা দিতে গেলাম, সে মানিল না। নিজেকে কিছু পরিমাণে সংযত করিয়া পরনের কাপড় সামলাইয়া কি জানি কেন আমার পায়ের কাছে আসিয়া একটা প্রণাম করিল, তারপর বড় ছেলেটার মাথায় মুহূর্তের

জন্য একবার হাত বুলাইয়া সটান দরজা দিয়া পথে বাহির হইয়া গেল।

মানদা নীরবে সমস্ত লক্ষ্য করিল, 'তারপর শান্তকণ্ঠে বলিল, 'ছেলে রেখে যাবে কোথায়, ঠিক ফিরে আসতে হবে।'

নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, 'ছেলে ত তার নয়, মানদাবাবু।'

দেখিলাম, মানদার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে। কেন জল আসিয়াছে, কী তাহার রহস্য, তাহা বুঝিলাম না, বুঝিবার চেষ্টাও করিব না। ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলাম।

দিন চারেক পরে মুটের মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় মানদা আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। কহিল, 'ঠাকুরপো, চ'লে যাচ্ছ?'

বলিলাম, 'হ্যাঁ।'

মানদা কহিল, 'ছোট ছেলেটার বড় অসুখ, হেদিয়েছে, কান্না থামছে না। তুমি তাকে ইস্কুল থেকে ফিরিয়ে এনে দাও ঠাকুরপো। নাকখৎ দিচ্ছি আর ঝগড়া করব না।'

বলিলাম, 'খোঁজ নিয়েছিলুম, ইস্কুলের কাজ সে ছেড়ে দিয়ে গেছে।'

'ওমা, তবে কোথায় গেল?'—মানদা শিহরিয়া প্রশ্ন করিল।

কোথায় গেছে কেউ তার খবর জানে না। আচ্ছা, আমি যাই। বলিয়া চলিয়া গেলাম, মানদা পাথরের মূর্তির মতো পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল।

*

*   *

নূতন বাসায় আসিয়া উঠিলাম। পথে আসিতে বেলা পড়িয়া গিয়াছিল, বাসায় আসিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া যখন স্থির হইয়া বসিলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অবেলায় খাইয়া আসিয়াছি, রাত্রে একটু ঠাণ্ডা জল খাইয়া শুইয়া পড়িব—এই মনস্থ করিয়া মেঝের উপর বিছানাটা ছড়াইয়া লইলাম। আজ আর কোথাও বাহির হইব না।

যে-লোকটির নিকট হইতে ঘরভাড়া লইয়াছি সে এই বাড়ীর চাকর। এতক্ষণ পরে আসিয়া সে দেখা দিল। তাহার হাতে একখানা মোটা কম্বল ও লেপ। বারান্দায় আমি বসিয়াছিলাম, সে আমার সহিত কোনো কথা না বলিয়া ঘরে ঢুকিল এবং যে-বিছানা আমি ছড়াইয়াছিলাম তাহা তুলিয়া ফেলিল। কথা সে কহিল না, আমিও তাহাকে কোনো প্রশ্ন করিলাম না, শুধু দেখিলাম কম্বল পাতিয়া বিছানা ছড়াইল ও আমার গায়ে দিবার জন্য লেপখানা পাট করিয়া রাখিল। বুঝিলাম, তাহার উপর অন্দরমহলের আদেশ হইয়াছে। কিন্তু কে তাহাকে আদেশ দিল, অপরিচিত ভাড়াটিয়ার উপরে এমন অযাচিত আতিথেয়তা কেনই বা প্রকাশ করা হইল, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দেখিলাম আমার কাপড়চোপড় সে গুছাইল, বাক্সটা যত্ন করিয়া রাখিল, কুঁজায় জল ভরিয়া আনিল,

হারিকেন লণ্ঠনে তেল ভরিয়া আলো জ্বালিল, তারপর ঝাঁটা দিয়া মেঝেটা ঝাঁট দিয়া একেবারে দশ মিনিটের ভিতর ঘরের শ্রী ফিরাইয়া দিল।

বাহির হইবার সময় বলিলাম, 'তোমার নাম কি হে ?'

সে কহিল, 'গদাধর।'

'তুমি এ-বাড়ীর মালিক নাকি ?'

'আজ্ঞে না, সে কি কথা ? আমি চাকর।'

বলিলাম, 'লেপ-কম্বল কে পাঠালো ?'

গদাধর উত্তর দিল না, হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

গত পরশু এই গদাধরই বলিয়াছিল, দশ টাকা করিয়া মাসে এই ঘরটির ভাড়া দিতে হইবে। আমি বলিয়াছিলাম, তিরিশ টাকা হাতখরচ পাই, দশ টাকা দিব কেমন করিয়া ? সাত টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারি। গদাধর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সাত টাকাতেই রাজী হইল। সুতরাং তাহাকে এ-বাড়ীব মালিক বলিয়া মনে কবা কিছু বিচিত্র নয়।

কুঁজা হইতে জল খাইয়া সবেমাত্র লেপ ঢাকা দিয়া শুইয়াছিলাম, এমন সময় শব্দ শুনিলাম। বাড়ীটা প্রকাণ্ড, এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও কোনো ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি বলিয়া সহজে বুঝা যায়। ইহার ভিতরে কোথায় মানুষ আছে, মানুষ একেবারেই আছে কিনা, তাহা কিছু বুঝিবার উপায় নাই। শব্দ পাইয়া আমি সজাগ হইয়া রহিলাম।

একটু পরেই গদাধর আসিল। মানুষটা বলিষ্ঠ, দুই হাতে একটা বড় টেবল্ বহিয়া আনিয়াছে! আমার ঘরে আসিয়া

একধারে টেবল্‌টা পাতিল, একখানা চেয়ার আনিয়া রাখিল। তারপর আবার চলিয়া গেল। ইহার কাজে বাধা দিবার মতো শক্তি যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি, দিলেও ফল হইবে না তাহাও যেন উপলব্ধি করিতেছি। সামান্য সাত টাকার ভাড়াটিয়ার উপর ইহাদের এমন নেক্‌নজর কেন হইতেছে, ইহার তাৎপর্য্যই বা কি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার মতো দরিদ্রকে কি ইহারা ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া উপহাস করিতে চায়?

গদাধর আবার আসিল। কহিল, 'উঠুন।'

দেখিলাম গরম চা ও খাবার সাজাইয়া ছোট একটা টিপাই সে দুই হাতে ধরিয়া আনিয়াছে। বলিলাম, 'এসব কোথা থেকে আন্‌লে গদাধর?'

গদাধর কহিল, 'দেখবেন চা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায় না।' বলিয়া একখানা তোয়ালে টাঙাইয়া রাখিয়া সে বাহির হইয়া গেল!

যাক্‌ বাঁচিলাম। নিকটে রাস্তায় একটা হোটেল আছে, এসব সেখানকারই। কিন্তু দেখিলাম খাবারের প্লেটের উপরে হিন্দু-মুসলমানেব ঐক্য ঘটিয়াছে, এত মূল্যবান ভোজ্যবস্তু তাহার আনা উচিত হয় নাই, দাম তো আমাকেই দিতে হইবে! তিবিশ টাকা মাহিনার পক্ষে ইহা বিলাস, যদি নিয়মিত বেতনও পাইতাম তাহা হইলেও না হয় বুঝা যাইত; কিন্তু স্বদেশী সংবাদপত্রে নিয়মিত বেতন পাওয়াটা স্বপ্নবৎ। খাইতে খাইতে স্থির করিলাম, গদাধরকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে। হোটেলে বোধ করি কমিশন পাইবার লোভে গদাধর এই

অপাট করিয়াছে। বাস্তবিক, কলিকাতার লোকগুলোকে চিনিবার কোনো উপায় নাই।

কিছুই খাইব না বলিয়া স্থির করিয়া জলযোগ করিলাম এবং তাহাও বেশ গুরুপাক মনে হইল। শীতকাল বলিয়া রক্ষা, সাহস করিয়া আহার করা যায়। চা খাইয়া টেবল্ ছাড়িয়া উঠিলাম। শুইতে আর ভালো লাগিল না, জামাটা গায়ে দিয়া আমি ঘরে তালা বন্ধ করিলাম।

এমন সময় কোথা হইতে গদাধর পুনরায় আসিল। কহিল, 'চাবিটা রেখে যাবেন, দরকার।'

অবাক হইলাম। আমার চাবিতে তাহার কী দরকার? দুই ঘণ্টার দেখাশুনায় একজন চাকরকে কতটুকু বিশ্বাস করিতে পারা যায় তাহাই ভাবিলাম। আমাকে এমনি একটা বিশ্রী অবস্থায় নিতান্ত অশিক্ষিত বলিয়াই সে ফেলিতে পারিল। কোন্ সাহসে সে চাবি চাহিল?

বলিলাম, 'টেবল্-চেয়ার কি বার ক'রে নিতে চাও?'

গদাধর কহিল, 'না, দিন না চাবিটা।'

'কোনো দরকার আছে?'

'হ্যাঁ।'

তবুও কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিলাম, 'আমার কিন্তু অনেক দামী জিনিসপত্র আছে, গদাধর।'

'থাক্, আমি চোর নই।'—বলিয়া গদাধর হাসিল।

নিতান্ত অনিচ্ছায় তাহাকে চাবিটা দিলাম। সে যে পাকা চোর, সরলভাবে 'চোর নই' বলিয়াই সে তাহা প্রমাণ করিয়া

দিল। একমাত্র সান্ত্বনা, মণিব্যাগটা আমার নিকট আছে। জিনিসপত্রের চেয়ে টাকার মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। কিন্তু তাহাকে চোখে চোখে রাখিব, কাছেই কোথাও লুকাইয়া থাকিয়া তাহার মতো কলিকাতার চোরকে কিছু সায়েস্তা করিয়া দিতে হইবে। ইহারা বোধ করি অতিথি বাৎসল্যের ফাঁদে ফেলিয়া সকল ভাড়াটিয়াকেই এমনি করিয়া জালে জড়াইয়া থাকে। ইহাদের নষ্টামি ঘুচাইব!

প্রায় পনেরো মিনিট পরে রাস্তায় লুকাইয়া থাকিয়া দেখিলাম, আমার ঘরের ভিতরে টর্চ লাইট জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এত সহজে হইবে তাহা ভাবি নাই। দ্রুতপদে আসিয়া ঘরের ভিতব দাঁড়াইলাম। বলিলাম, 'কি হচ্ছে হে গদাধর?'

'এই আলোটা—' বলিয়া গদাধর সামান্য একটা উত্তর দিয়া কড়িকাঠের নিকট তার খাটাইতে লাগিল। সে যেন আমার কথা গ্রাহ্য করিল না। আমার ঘরে দাঁড়াইয়া আমার কথার উত্তব দিবার সময় একজন চাকরের নাই,—তাহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

আসিয়া অবধি লক্ষ্য করি নাই, আমার ঘরের ভিতরে ইলেকট্রিকের বন্দোবস্ত রহিয়াছে, তার টাঙাইয়া গদাধর তাহাকে কাজের উপযোগী করিয়া তুলিল। তারপর সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিল। ঘরখানা যেন হাসিমুখে আমাকে ভিতরে অভ্যর্থনা করিল।

টেবল্, চেয়ার, টিপাই, লেপ-কম্বল, অত্যুৎকৃষ্ট জলযোগ, সর্ব্বোপরি ইলেকট্রিকের আলো,—সবগুলা একবার ভাবিয়া

লইতে সময়ের দরকার। যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ সারিয়া গদাধর বাহির হইয়া যাইবার সময় বলিলাম, 'ওহে, একখানা ভালো খাট, একখানা আল্‌মারি, আর খানকয়েক ছবি—'

'খুব।'—গদাধর কহিল, 'এখুনি আন্‌ছি, ওপরের ছোট ঘরে অনেক আছে, আমি যাবো আর আসবো।'

যেমন কথা তেমনি কাজ। গদাধর কোথা হইতে আরো দুইটা লোক যোগাড় করিয়া আনিল। আমি বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলাম, তাহারা শুইবার খাট আর আল্‌মারি আনিয়া সমস্ত গুছাইয়া একেবারে হাল-আমলের বালীগঞ্জী আভিজাত্যকে প্রকট করিয়া তুলিল। বিলাতী স্ত্রীলোক ও কুকুরেব ছবি আনিয়া দেয়ালে টাঙ্গাইল। মনে কবিলাম কাল বহুবাজারের চোরাবাজার হইতে সস্তায় গোটা দুই ফুলদানী কিনিয়া আনিতে হইবে।

খাটের উপর বিছানা পাতা। গদাধর সবান্ধবে চলিয়া যাইবাব পর গদির উপব গা এলাইয়া দিলাম। বিছানা, বালিশ, লেপ,—আমি যেন তাহাদেব ভিতর ডুবিয়া গিয়াছি। বাস্তবিক, সন্দেহ করিয়া এই লোকটার উপর অবিচাব করিতেছি কিনা কে জানে! দাবিদ্র্যটা আমাব রক্তগত, সুতরাং হঠাৎ সৌভাগ্য আসিয়া দাঁড়াইলে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মনে আসিতে থাকে।

দেখিতে দেখিতে আমার টাইম-পিস্ ঘড়িটায় রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিল। লেখাপড়ার কাজ কিছু আছে, কিন্তু আজ এই আরামের শয্যায় শুইয়া সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম লইব, কোনো কাজ করিব না। ঘুমাইবার আগে দরজা বন্ধ করিব ভাবিয়া

রাখিয়াছি, কিন্তু আজ ঘুম আসিবে কিনা সন্দেহ। মেঝের উপরে শোয়া আমার অভ্যাস। কিছু কাঠিন্য, তাহারই ভিতর হাত-পা কুণ্ডলী করিয়া শুইলে আমার ঘুম ভালো হয়; এত নরম বিছানায় শুইয়া আমি অস্বস্তি বোধ করিতে থাকি। যাহা হউক, দিনে দিনে অভ্যাস হইয়া যাইবে মনে করিয়া আমি দরাজাটা বন্ধ করিবার জন্য উঠিলাম।

এমন সময় আবার গদাধর আসিল। তাহার দুই হাতে রাত্রির আহারের সরঞ্জাম। দেখিতেছি এই লোকটা আমাকে দেউলিয়া করিয়া ছাড়িবে। আমাকে বড়লোক ভাবিয়া তুষ্ট করিতেছে, তাহার ভুল নির্ম্মমভাবে ভাঙিয়া না দিলেই আর চলিতেছে না।

বলিলাম, 'আমার ত আর ক্ষিধে নেই গদাধর?'

গদাধর টিপাইয়ের উপর খাবার রাখিল, পরে কহিল, 'সে কি হয়, রাত-উপোসে শরীব খারাপ হবে।'

'খানিক আগেই ত খেলুম হে।'

'সে ত সামান্যই, দাঁড়ান, জল আনি।' এই বলিয়া সে খাবার জল আনিল। হাত মুখ ধুইবার জন্য গরম জলও আনিয়া রাখিল। তারপর পান আনিয়া দিল।

ভীষণ সমস্যা! কিন্তু না খাইয়া উপায় নাই, সে চলিয়া যাইবার পর চেয়ার টানিয়া আমি খাইতে বসিলাম। আহারের তালিকা সুবর্ণবণিকের রন্ধনশালাকেও হার মানাইয়া দেয়। চিবাইয়া, চাটিয়া, চুষিয়া এবং গিলিয়া সমস্ত খাবারগুলিই পনেরো মিনিটের ভিতর নিঃশেষ করিয়া দিলাম। হঠাৎ মনে

পড়িয়া গেল, গদাধরকে অগ্নিমান্দ্যের কথা বলিয়াছি! ভাবিয়া লজ্জা হইল। আমার থালা বাটি দেখিয়া সে যাহা প্রমাণ পাইবে তাহাতে আমি অত্যন্ত খেলো হইয়া যাইব। কিন্তু কি করিব, নিজের ক্ষুধার চেহারাটা নিজেই বুঝি না।

কালান্তকের মতো গদাধর ঠিক এক সময় আসিল। থালা বাটি গেলাস সে তুলিয়া লইবে—এমন সময় আমি মণিব্যাগ হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া বলিলাম, 'তখনকার টিফিন আর এখনকার ডিনার,—একটাকা নিশ্চয় হয়েছে, কি বলো গদাধর? তোমাকেও আমি কিছু টিপ্‌স্ দেব।'—বলিয়া পুনরায় ব্যাগ খুলিতেছিলাম।

গদাধর অবাক হইয়া কিয়ৎক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমাকে সে যেন বেমক্কা এবং বেহিসাবী লোক বলিয়া মনে করিতেছে। প্রথমটা সে কথা কহিল না, তারপর কাঁচের বাসনগুলি হাতে লইয়া সে কহিল, 'আজ্ঞে, এটা গেরস্থ বাড়ী।'—বলিয়া চলিয়া গেল।

তবে আমি কোথায় আসিয়াছি? গৃহস্থরা কোথায়? নেপথ্যে থাকিয়া কে আমার অভাব-অভিযোগ, আহার-বিশ্রামের নিখুঁৎ আয়োজন করিয়া দিতেছে? এইবার ভয় হইল। কোনো রহস্যময় ষড়যন্ত্রের ভিতরে আসিয়া পড়ি নাই ত? ভূতের গল্প অনেকটা এইরূপ শুনিয়াছি; এই অট্টালিকার অন্ধকূপগুলিতে যদি তেমন কিছু থাকে—?

পেটের ভিতরে খাবারগুলি যেন কোলাহল করিয়া উঠিল, গা বমি-বমি করিয়া আসিল; আমি দ্রুতপদে গিয়া ছুইটা দরজা

উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিলাম।

রাত্রি কাটিল, সকাল হইল। দরজা খুলিয়া দেখিলাম অনেক বেলা হইয়াছে। বাহিরে গিয়া মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম। গদাধর ঘর ঝাঁট দিয়া গেল। ভূতও নয়, ষড়যন্ত্রও নয়।

স্নান করিয়া চা খাইলাম, জলযোগ করিলাম। তারপর গদাধর আসিয়া কহিল, 'আপনাকে ডাকচেন।'

বলিলাম, 'কে?'

সে কহিল, 'আসুন।'

তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। ঘরের পর ঘর, দালানের পর দালান,—তারপর উঠান, দুর্গাদালান,—তারপর অন্দর-মহল। সেখানে গিয়া কারো কারো গলার আওয়াজ পাইলাম। রান্নাঘরে বামুন রাঁধিতেছে, ঝি কাজ করিতেছে। পাশেই সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়া দোতলায় গিয়া উঠিলাম।

ঘরগুলির কোলে প্রকাণ্ড দালান। তাহারই একটা জানলা দিয়া শীতের সুখকর রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। সেই রৌদ্রে পিঠ দিয়া দুই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা বসিয়াছিলেন। কাছেই একখানা কার্পেটের সতরঞ্চি পাতা ছিল। বৃদ্ধা উঠিয়া আসিয়া কহিলেন, 'এসো বাবা, এসো। গদাধরের কাছে শুনলুম তোমার কথা। বসো ওইখানে।'

আমি বসিলাম। ইঁহারা যে স্বামী-স্ত্রী তাহা প্রথমে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম। বৃদ্ধা কহিলেন, 'কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ত বাবা?'

বলিলাম, 'আজ্ঞে না, এমন জায়গায় যে আসবো এ স্বপ্নেও ভাবিনি !'

দুইজনেই লোলচর্ম্ম। একজনের পঁচাত্তর এবং আর একজনের অন্ততঃ আশি হইবে। দুইজনেই গৌরবর্ণ। বৃদ্ধার পরনে রাঙাপাড় শাড়ী, কপালে জ্বলজ্বলে সিঁন্দূর, হাতে দুগাছা সোনার বালা। কিন্তু দুইজনেই যেন অতীতকালের জরাজীর্ণ কঙ্কাল, কবে যে ইহাদের ডাক আসিবে তাহা যেন গণিয়াও বলিতে পারা যায়।

স্ত্রী কহিলেন, 'সব ঘরই প'ড়ে আছে···এত বড় বাড়ী, মানুষ থাকলে তবু স্বস্তি পাই,—ওগো, তোমাকে এইবার তেল মাখিয়ে দিই—কেমন ?'

উত্তব শুনিবার আগেই বৃদ্ধা গিয়া সুগন্ধী তেল স্বামীর গায়ে মাখাইতে মাখাইতে পুনবায় কহিলেন, 'বাবা, তুমি যে ঘরটিতে এসে উঠেছ, এতেই আমাদের খুব উপকার হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া তোমার আমাদের কাছেই হবে।'

বলিলাম, 'বেশ, তার জন্য মাসে মাসে আমাকে কত দিতে হবে ব'লে দিন ? আমি তিরিশ টাকা মাইনে পাই।'

দুইজনেই হাসিলেন। এমন সময় গদাধব বালতি করিয়া স্নান করিবাব জন্য গবম জল আনিয়া রাখিল, তারপর তোয়ালে আর কাপড় এবং অন্যান্য সজ্জা। স্বামীর গায়ে-মাথায় জল ঢালিয়া স্ত্রী অতি যত্নে স্নান করাইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ কহিলেন, 'কোথায় চাকরি করো বাবা তুমি ?'

বলিলাম, 'একখানা দৈনিক সংবাদপত্রের অফিসে।'

'বেশ বেশ, লেখাপড়ার কাজ'—বলিয়া বৃদ্ধ হাসিয়া পুনরায় কহিলেন, 'ছেলের মতন তুমি, টাকা না দিলে কি তুমি থাকবে না?'

তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া দুইজনেরই মুখের দিকে তাকাইলাম। মাথায় ঘোমটা টানিয়া স্ত্রী কহিলেন, 'কি করব বাবা আমরা তোমার টাকা নিয়ে? আমাদের খাবে কে? তোমার ওই সাতটি টাকা ছাড়া আর আমরা কিছু নিতে পারব না!'

অবাক হইয়া রহিলাম। ইহাদেরই কি প্রাচীন বলে? ইহারাই কি সেই সুদূর অতীতকালের বর্ত্তমান অবশেষ? প্রথমটা আমি যেন দিশাহারা হইয়া গেলাম। টাকা দিয়া পৃথিবীর সমস্ত কিছুই যাচাই করিয়া থাকি,—যশ, সম্ভ্রম, প্রতিষ্ঠা, এমন কি স্নেহ ভালোবাসা পর্য্যন্ত,—আজ ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া আমি যেন চমকিয়া উঠিলাম। ধনীদের হৃদয় নাই বলিয়াই জানি, যশখ্যাতির জন্য তাহারা দানশীল হয়, সম্পদকে নিরুপদ্রবে ভোগ করিয়া যাওয়াই তাহাদের কাজ, দাক্ষিণ্যটাও তাহাদের বিলাস। এখন হইতে কি আমাকে সেই মত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

স্ত্রীর সেবা দেখিয়া অবাক হইলাম। কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম, বৃদ্ধ স্বামী সন্তানের তুল্য! সেই কথাটা আজ যেন মূর্ত্তি লইয়া আসিয়া হাজির হইল। মাথা মুছাইয়া, কাপড় পরাইয়া, চুল আঁচড়াইয়া দিয়া স্বামীকে তিনি ধরিয়া তুলিলেন। অসুস্থ নয়, অথর্ব্ব। ফল পাকিয়াছে, কবে একটু বাতাসে

বোঁটা হইতে খসিয়া পড়িবে। সমস্তক্ষণ বসিয়া বসিয়া আন্তরিক সেবা-যত্নের বিচিত্র চেহারা দেখিলাম। কেবল কর্ত্তব্য ও সেবা নয়, যেন আরো কিছু, যেন জীবনভরা বোঝাপড়ারই একটা পরিচয়। ইহাকে বৃহত্তর সামঞ্জস্য বলিতে পারি, ইহাকে পারস্পারিক কল্যাণবোধ বলিতে পারি।

স্বামীকে ঘরে তুলিয়া দিয়া বৃদ্ধা আমার কাছে আসিয়া বসিলেন। হাসিয়া কহিলেন, 'স্নান করতে পরিশ্রম হয়েছে কিনা, এবার উনি একটু বিশ্রাম নেবেন।'

আমি ইঁহার পৌত্রের বয়সী, তবু আমার কাছে বসিয়া অনেকখানি ঘোমটা টানিয়া দিলেন। জীর্ণ শীর্ণ দেহ, শিরাবহুল, মাথাটি সম্পূর্ণ সাদা, মুখশ্রী যেন মাতৃমূর্ত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবীমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে।

বলিলাম, 'আপনার ছেলেমেয়েরা কোথায় ?'

'সব বিদেশে বাবা।'—বলিয়া দেবী প্রসন্ন হাসি হাসিলেন। পুনরায় বলিলেন, 'দুজন বিলেতে, একজন জাপানে, একজন বম্বের জাহাজে···এরা আমার চারটি ছেলে। আর একটি মেয়ে।'

বলিলাম, 'তাঁর বিয়ে হয়েছে কোথায় ?'

তিনি কহিলেন, 'তারা থাকে দিল্লীতে। আমার মেয়ের নাতি হয়েছে, বাবা। তাদের অবস্থা বেশ ভালো।'

'আপনার স্বামী কি করতেন ?'

'ইনি ? ইনি ছিলেন হাইকোর্টের জজ। সে অনেকদিনকার কথা। প্রায় কুড়ি বছর ওঁর পেন্‌সন হয়েছে। মানুষটা যে

কত বড়, কত ভালো ছিল—!'

বৃদ্ধা অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। স্বামীর অতীত মহিমা যেন তাঁহার মুখে চোখে গৌরবের প্রদীপ জ্বালাইয়া দিল। বর্ণনা করিয়া জানাইবার যেন আর কিছু নাই, গর্ব্ব প্রকাশ করিবার মতো সাধারণ প্রবৃত্তিও সে মুখে ফুটিল না। বিনয় নম্রতা ও নিরভিমানে এই লোলচর্ম্মা বৃদ্ধার মুখেও যেন লাবণ্য-লেখা ফুটিয়া উঠিল। বুঝিলাম, অমৃতফল উত্তমরূপে পাকিয়াছে, তাই তাহার রস প্রাণকে পর্য্যন্ত মধুর করিয়া তুলে।

বলিলাম, 'ছেলেমেয়েরা কাছে না থাকলে আপনার ত অসুবিধে!'

বৃদ্ধা কহিলেন, 'কি করব বাবা, এখন যে তাদের সময়। আমাদের দেনা-পাওনা ফুরিয়েছে, তাদের এখন আরম্ভ। কাছে থাকলে কি চলে?'

চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'আর কি, এবার বাঁধন কাটুক। জমা-খরচের খাতা ভ'রে গেছে, আর জায়গা নেই। ওঁর কথা বল্‌ছ? উনি এখন গেলেই আমি নিশ্চিন্ত হই বাবা!'

অবাক হইলাম। হিন্দু স্ত্রীর মুখে একি কথা! যাঁহার প্রতি এত শ্রদ্ধা আর অনুরাগ, তাঁহার মৃত্যুকামনা? কিন্তু বৃদ্ধা আমার মুখের দিকে চাহিয়া ম্লান হাসিয়া পুনরায় কহিলেন, 'অনেক হয়েছে, আর না। সামান্য মকরধ্বজ, একটু ফলের রস, দু'একটি শাক পাতা, আর একটু দুধ। হ্যাঁ, ওঁর এখন যাওয়াই ভালো বাবা। নইলে কা'র হাতে তুলে দিয়ে যাবো? সে

আমি পারব না। আট বছর বয়সে এসেছি ওঁর কাছে, আজ অবধি একদিনও কাছছাড়া করিনি। তাই কি পারি, কা'কে বিশ্বাস করব?'

বলিলাম, 'কিন্তু যে ক'দিন উনি বাঁচেন—'

'না না বাবা, সে কথা আর বলো না।'—বৃদ্ধা যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন,—'ওঁর হাড়খানা গঙ্গায় না দিয়ে গেলে আমি কি শান্তি পাবো? এখন ওঁর মৃত্যুরই দরকার!'

সেদিনকার মতো উঠিলাম। আমি দরিদ্র, আমার টাকা বাঁচিয়া গেল, তাহার জন্য আমার আনন্দ কম নয়; কিন্তু লাভ-লোকসান ছাড়াইয়াও আমি যাহা শুনিয়া গেলাম তাহা স্মরণ করিয়া রাখিব।

ইহারই কি নাম ভালোবাসা? মৃত্যুকে ভয় না করিয়া যে আমন্ত্রণ করিতে থাকে, ভালোবাসার ভিতর দিয়া সত্যই সে কি মরণকে জয় করিল? বিচ্ছেদে ভয় নাই, বেদনায় পরান্মুখ নয়, বৈধব্যে দুঃখ পাইবে না—ইহাকে কী বলিব? প্রেম কি জীবন-মৃত্যুকে সত্যই হার মানাইতে পারে?

*

* *

নূতন বাসায় অনেকদিন আরামে কাটিল। পথ-ঘাটের সহিত পরিচয় হইয়াছে, পাড়ার লোক চিনিয়াছে। ক্বচিৎ কাহারও সহিত নমস্কার বিনিময়ও হয়। গদাধর আমার বিনা মাহিনার

চাকর, তাহার সেবাযত্নে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতরে আমার দিন কাটে। দৈনিক সংবাদ-পত্রের অফিসে আমি যে তিরিশ টাকার য়্যাপ্রেন্টিস্ তাহা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি।

আমার ঘরের সম্মুখে পথের ওপারে একখানা মণিহারি দোকান। 'সেফ্‌টি রেজরের ব্লেড' কিনিতে কিনিতে দোকানের মালিকের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। নিজের নাম আমি বলি নাই, তৎসত্ত্বেও দেখি একদিন লোকটা আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া আমাকে নমস্কার জানাইল। কেমন করিয়া জানিয়াছে কে জানে!

দোকানের উপরতলায় এক গৃহস্থ থাকে। কর্ত্তা, গৃহিণী, দুই চারিটি ছেলেমেয়ে; চাকর, বামুন, ঝি। কর্ত্তা সরকারি চাকরি করেন, বড় মেয়ের বিবাহ দিয়াছেন এবং বড় ছেলেটির চাকরি করিয়া দিয়া তাহার জন্যও বধূ ঘরে আনিয়াছেন। বিষয়ী ব্যক্তি, তাঁহার কোনো কাজেই ত্রুটি নাই। সুখের সংসার; ছন্দের উপরে যেন কবিতা দাঁড়াইয়া আছে। একটি আঁটসাঁট গৃহস্থ, কোথাও ফাঁকি নাই, কোথাও গ্রন্থি আল্‌গা হইয়া নড়বড় করে না। আমি ঘরে বসিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে রেডিও ও গ্রামাফোনের গান শুনিয়া থাকি; এমন কি তাঁহাদের দোতলার সম্মুখের ঘরে উচ্চকণ্ঠে কথাবার্ত্তা হইলে তাহাও স্পষ্ট আমার কানে আসে। আমাকে দুই-চারদিন তাঁহারা চা খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার বড় ছেলের নাম বিজন। চেহারা সুশ্রী, ভদ্র ব্যবহার। বি-এ পাশ করিয়া বাপের অফিসে ঢুকিয়াছে।

বাপ বলিয়াছেন, 'মেধা থাকিলে একদিন চাকরির উন্নতি হইবে। আপাতত বেতন অল্প বলিয়া দুশ্চিন্তার কারণ নাই।' মেধা তাহার আছে, ছেলেটি পড়াশুনা লইয়াই থাকে।

বিজনের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। সকালের দিকে আমার ঘরে প্রায়ই সে নানাজাতীয় সাময়িক পত্র উল্‌টাইতে আসে। কথাবার্ত্তায় বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাই। রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক তরুণীর অঙ্গসজ্জা—প্রায় কিছুই বাদ যায় না। মাঝে মাঝে সমাজতত্ত্ব হইতে প্রেমের গবেষণাও আসিয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা দেখিয়া তাহার মুখে করুণার হাসি ফুটিয়া উঠে।

একদিন তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, 'কাল আপনার বাড়ীতে কি হয়েছিল বিজনবাবু?'

বিজন সিগারেট ধরাইয়া কহিল, 'রাত্রে আমার স্ত্রীর চোখে আলো সহ্য হয় না, অথচ আমাকেও পড়াশুনো করতে হয়—ওই একটিমাত্র ঘরে,—ধরুন এই নিয়েই মা-বাবার সঙ্গে বচসা—'

বলিলাম, 'আপনার স্ত্রী কি অসুস্থ?'

বিজন বলিল, 'না, তবে তাঁর লেখাপড়ায় কোনো স্বাদ নেই কিনা,—খুব সাধারণ মেয়ে আর কি! এই সব নিয়েই,—অবশ্য এমন বিশেষ কিছু নয়।'

'কতদিন আপনি বিয়ে করেছেন?'

'তা প্রায় বছর দেড়েক হোলো। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো নয়। মানে উপস্থিত কোনো অসুখ নেই বটে তবে য়্যানিমিক্,—স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে আর কিছু না-হোক ঘরকন্নারও ত একটা

অসুবিধে হয়।'—এই বলিয়া বিজন সেদিনকার মতো উঠিয়া পড়িল।

সে যাহা বলিয়া গেল তাহা বিশ্বাস করিলাম, তবুও প্রশ্ন আমার ভিতরে উঠিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। একটি গৃহস্থ পরিবার সম্বন্ধে আমার এই অকারণ কৌতূহলটা খুব মার্জ্জিত রুচির পরিচয় নয়, কিন্তু ইহাদের চাপা কলহবিবাদের অন্তরালে নিগূঢ় কারণ কিছু যে নিহিত আছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও এই সন্দেহটাকে মন হইতে তাড়াইতে পারিলাম না।

আর একদিন বিজন আমাকে প্রশ্ন করিল, 'আচ্ছা, এই স্ত্রী-আন্দোলনটা কী চায় বলুন ত?'

বলিলাম, 'বোধ হয় স্বাধীনতা চায়।'

সে কহিল, 'না, আমার মনে হয় ওরা চায় স্বাস্থ্য, মনোমতো স্বামী, সুশৃঙ্খল সংসার,—একথা মিথ্যা যে ওরা আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রগুলোকে অধিকার করতে চায়।'—এই বলিয়া সে একটা আলোচনা আনিয়া ফেলিল।

'প্রমাণ?'—তাহাকে প্রশ্ন করিলাম।

'প্রমাণ এই যে, ওরা রাজনৈতিক আন্দোলনেব ছদ্মবেশে আজ সমাজবিদ্রোহ জাগিয়ে তুলছে।'—বিজন যেন সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিল, 'আজ একটি মেয়েকেও দেখাতে পারেন, যে সত্যি সত্যি রাষ্ট্রনীতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? আমার মনে হয় ওরা চায় সামাজিক সাম্য, সমানাধিকার, রাষ্ট্র-স্বাধীনতা নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই ওরা চাইছে জোর ক'রে।'

বলিলাম, 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গোড়ায় থাকে আর্থিক স্বাধীনতা।

ওরা কি সম্পদ সৃষ্টি করতে পেরেছে ?'

বিজন কহিল, 'এদেশে মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। জল হাওয়ার গুণে সম্পদ সৃষ্টি করা ওদের পক্ষে কিছু কঠিন, তাই ওরা প্রথম আক্রমণ করছে পুরুষের মালিকানা স্বত্বকে। বিবাদ এইখানে। আমার মনে হয় ওরা কর্ম্মক্ষেত্রের ঠিক পথটি খুঁজে পায়নি, ওরা যা চায় তা এখন ওদের নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়; পশ্চিমের ঢেউ এসে ওদের সম্প্রতি চঞ্চল ক'রে তুলেছে, এই মাত্র।'

এমনি করিয়াই বিজন আমার সহিত আলাপ করিয়া যায়। একদিন তাহার মনের কথা টানিবার জন্য বলিলাম, 'আচ্ছা, এই যুব-আন্দোলন সম্বন্ধে আপনি কিছু ভেবেছেন ?'

সে কহিল, 'আমি ছিলুম ওর মধ্যে।'

তাহার মুখের দিকে তাকাইলাম। সে পুনরায় কহিল, 'আমাকে জেল পর্য্যন্ত খাট্‌তে হয়েছে।'

'কেন ?'

সে হাসিল। কহিল, 'গত আন্দোলনে—'

বলিলাম, 'সে কথা নয়, বলছিলাম এখনকার যুবকদের মনোভাব। রাষ্ট্রিক আন্দোলন নয়।'

বিজন কহিল, 'ওঃ তাই বলুন। বিশেষ স্পষ্ট ধারণা আমার নেই, তবে মনে হয়, যুব-আন্দোলনের দুটো দিক বিবেচনা করা দরকার।'—আবার সে গুরুভার আলোচনা আনিল।

মুখ তুলিলাম। সে কহিল, 'রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা চায় একটা দল; তারা চায় জাতটাকে গড়তে, তারা চায় শাসন করবার

অধিকার,—তাদের সেই অবরুদ্ধ সৃজনী-শক্তি আত্মপ্রকাশের জন্য রাষ্ট্রিক আন্দোলন চালিয়েছে। তারা আবিষ্কার করবে, যুদ্ধ করবে, ভোগ করবে, জয় করবে,—স্বাধীনতার স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তাদের এই শক্তি নিহিত রয়েছে।'

প্রশ্ন করিলাম, 'আর একটা দিক কি ?'

'সেটা বড় ভয়ানক। যুব-আন্দোলনের সেই দিকটাই বিপজ্জনক।'—বলিয়া বিজন হাসিল।

আমার শুনিবার ইচ্ছাটা বুঝিতে পারিয়া সে পুনরায় কহিল, 'সেটা সমাজ-বিপ্লবের দিক। প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ। দেশের ছাত্র-সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাদের মধ্যে একটা গভীর অসন্তোষ জমে উঠেছে। কেবল নাগরিক স্বাধীনতার অভাব বলছিনে; অশিক্ষার বাধা, নীতির বাধা, পরিবারের কুসংস্কারের বাধা। এদের ভিতর দিয়ে তাদের স্বচ্ছন্দে চিন্তাশক্তির পথ নেই; জীবনে তারা কোনো আদর্শ খুঁজে পাচ্ছে না; দিনে দিনে কর্ম্মশক্তির মেরুদণ্ড তাদের ভেঙে যাচ্ছে; প্রাণের রস যাচ্ছে শুকিয়ে। এইটেই ভয়ঙ্কর, বুঝলেন ? বেকার সমস্যাটা বাহ্যিক, কিন্তু এই বাহ্য সমস্যাটার তলায়-তলায় ভাব-বিপ্লবের যে বারুদ জম্‌ছে দিনে দিনে, একদিন সামান্য একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গে সমগ্র সমাজকে সে ধ্বংস করবে !'

বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। এইবার বিজন উঠিয়া পড়িল। বেলা সাড়ে দশটায় তাহার অপিস। আমার সহিত কথা বলিতে বলিতে একদিন তাহার বেলা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহার বাবা একটু কড়া কথা শুনাইয়া ছিলেন।

দিন চারেক পরে গদাধরের কাছে চা খাইয়া আমি একটা প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি, এমন সময় বিজনদের বাড়ীতে একটা গোলমাল উঠিল। বেলা তখন দশটা বাজিয়াছে। গদাধরকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু সে কোনো সদুত্তর দিতে পারিল না।

সম্মুখে মণিহারি দোকানটা বন্ধ আছে, মালিক অসুস্থ বলিয়া তিন-চারদিন দোকান খুলে নাই। জানলার ধারে গিয়া বসিলাম। কেন বসিয়া আছি তাহার জন্য কৈফিয়ৎ চাহিবার লোক কেহ নাই। এখান হইতে উহাদের উপরতলার সমস্ত কথাবার্ত্তাই সহজে শোনা যায়।

প্রথম কথাতে বুঝিলাম বিজন ও তাহার বাবা এখনও অফিসে যান নাই। বিজনের মা কাছেই কোথাও দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারও গলা মাঝে মাঝে পাইতেছিলাম। আজ সকাল হইতেই কি যেন একটা কথা লইয়া বিতণ্ডা উঠিয়াছে।

বিজন কহিল, 'না, আমি যাবো না।'

কর্ত্তা কহিলেন, 'যাবো না মানে কি?'

'আমার ইচ্ছে নেই।'

'তোমার ইচ্ছে নেই চাকরি করতে?'

'না, চাকরি আমার ভালো লাগে না। প্রতিদিন একঘেয়ে দাসত্ব, প্রতিদিন পেটের অন্নের জন্য একটা শাসন মেনে চলা, এ আমি পারব না। আমার কি এই কাজ? এই জন্যে কি আমি বি-এ পাশ করেছিলুম?'

কর্ত্তা কহিলেন, 'কিন্তু সংসারের দায়িত্বটা—'

বিজন কহিল, 'সংসার আপনার, আমার নয়।'

'মনে রেখো বিজন, তুমি বিয়ে করেছ।'

'বিয়ে করেছি আমি? কখনো না। বিয়েটা আপনি চাপিয়ে দিয়েছেন আমার ওপর। একটা কঙ্কালসার মেয়ে, অশিক্ষিত, অসভ্য; যার কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, আত্মসম্মান কথাটার অর্থ যে জানে না, জানোয়ারের মতন আহার-নিদ্রা নিয়েই যার দিন কাটে,—এমন একটা মেয়ের গুরুভার আপনি আমার মাথায় তুলে দিয়েছেন। কেন? কী শত্রুতা ছিল আপনার সঙ্গে?'

কর্তা বলিলেন, 'ছাঁদ্‌নাতলায় আমি গিয়ে দাঁড়াইনি, বিজন।'

বিজন কহিল, 'আমি দাঁড়িয়েছিলুম, আপনার হুকুমে, কারণ আপনি আমার বাবা। আপনি জানতে চান না যে, সময়ের চেহারা বদলে গেছে, আপনাদের যুগ আর নেই।'

কর্তা কহিলেন, 'বহুবার এই নিয়ে তুমি বিবাদ করেছ। কিন্তু একটা কথা শেখোনি যে, বাপের উপর বি-এ পাশ করা ছেলেরও কিছু কর্ত্তব্য আছে।

'কর্ত্তব্য?—বিজন চেঁচাইয়া উঠিল, সুযোগ দিয়েছেন কর্ত্তব্য করার? অগাধ জলে ডুবিয়ে দিয়ে এখন আপনি কী আশা করেন আমার কাছে?'

কর্ত্তা চুপ করিয়া রহিলেন। বিজন বলিতে লাগিল, 'পঞ্চাশ টাকা মাইনে আমি পাই, পনেরো টাকা হাত খরচ। আপনি কি বলতে চান্ এই পনেরোটা টাকার জন্যে আমি দশটা-পাঁচটা জীবন পাত করব?'

পিতা কহিলেন, 'যদি শক্তি থাকে উন্নতি করবে একদিন।'

বিজন কহিল, 'উন্নতি! উন্নতির মানে বছরে তিন টাকা ক'রে মাইনে বেড়ে চলা। চুল যখন পাকবে তখন পাবো একশো পঁচিশ। একে উন্নতি বলবেন? একে বলবেন জীবন?'

তিনি বলিলেন, 'ছাত্রদল নিয়ে ছিলে, সভাসমিতি ক'রে বেড়াতে, আড্ডা দিতে—তার চেয়ে এটা ভালো নয়?'

'না, কিছুতেই না। সেই ছিল আমার ভালো, সেইদিকেই আমার রুচি। একদিন আমি বড় হ'তে পারতুম, দেশের ভালো কাজ নিয়ে থাকতুম—আমার সর্ব্বনাশ করলেন আপনি। কী করব এখন থেকে! রুগ্ন কঙ্কালের বোঝা টেনে চলা আর চিরজীবন কেরানিগিরি! এর নাম বি-এ পাশ করা, এর নাম লেখাপড়া? যাবো না আমি অফিসে।'

ইহার পর কি হইল তাহা আমি আর শুনিলাম না। গদাধর আসিয়া কহিল, 'আপনার স্নান করবার সময় হয়েছে।'

পিতা-পুত্রের অসমাপ্ত আলাপ ছাড়িয়া আমি জানলার নিকট হইতে সরিয়া আসিলাম।

দেখিলাম পরদিন হইতে বিজন পুনরায় অফিসে বাহির হইতেছে। প্রতিবাদ উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই, একটা অদ্ভুত নিয়মে পৃথিবী চলিতেছে, মানুষ যেন যন্ত্র বিশেষ, স্বাতন্ত্র্য তাহার কিছু নাই।

সংসারে ও পরিবারে একটা বিশেষ ছাঁচ আছে, সেই ছাঁচের সহিত মিলাইতে না পারিলে যত অশান্তি।

একদিন বিজনকে প্রশ্ন করিলাম, 'এ-কদিন আসেননি কেন, বিজনবাবু?'

সে কহিল, 'সকালবেলা একটা টুইশনি পেয়েছি, পড়াতে যাই। বাস্তবিক টাকার প্রয়োজন সংসারে এত বেশী—'

বলিলাম, 'আজকের খবরটা দেখেছেন ? নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলন হচ্ছে যে—'

বিজন কহিল, 'তাই নাকি, কদিনই কাগজ পড়িনি। যাই বলুন, ওসব কিছু হবে না। নিজের পায়ে দাঁড়ানো আর নিজের চারিপাশে উন্নতি ক'রে চলা—এইটেই আদর্শ হওয়া উচিত।—' তাহার কণ্ঠস্বরের আগুন নিবিয়া গিয়াছে।

হাসিয়া বলিলাম, 'সে কি, দেশের আর দশের কাজটাই ত আপনার কাছে বড় আমি জানতুম।'

'হ্যাঁ, বড় অবিশ্যি, সে কথা একশোবার, তবে—' এই বলিয়া সে আলোচনা থামাইয়া দিল। তাহার আর কিছুতেই রুচি নাই।

বলিলাম, 'রবিবার ত আপনার ছুটি, আমিও ঘরে থাকি, আসবেন। আলাপ করা যাবে।'

সে কহিল, 'আসবো বৈকি, নিশ্চয়ই আসবো। আচ্ছা, আপনি পাশা খেলা জানেন ?'

বলিলাম, 'একটু একটু জানি।'

বিজন উৎসাহিত হইয়া কহিল, 'তবে রবিবারে আপনিই আসবেন আমার বৈঠকখানায়। আমার কয়েকজন বন্ধু আসেন নিয়মিত, তাঁরা খুব পাশার ভক্ত। আমারো বেশ নেশা ধরেছে ওটায়।'

এই বলিয়া সে সেদিনকার মতো চলিয়া গেল।

দিন-চারেক পরে পথে বিজনের সহিত দেখা হইল। একটি

সুসজ্জিতা তরুণীকে লইয়া সে দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। কহিল, 'অফিসে যাচ্ছেন বুঝি ?'

বলিলাম, 'হ্যাঁ, আপনি কোন্ দিকে ?'

সে কহিল, 'এই, ইনি আমার শালী, দেশ থেকে এসেছেন। সিনেমায় নিয়ে যাচ্ছি ম্যাটিনী শোতে।'

তুইজনে তুইদিকে চলিয়া গেলাম! সে পঞ্চাশ টাকার কেরানী, শালীকে লইয়া সিনেমায় যাইতে পারে; আমি তিরিশ টাকার সাংবাদিক, চানাচুর ছাড়া আমার ভাগ্যে আর কিছু জুটিবার নয়। কিন্তু বিজনকে দেখিয়া আমি যেন একটু স্বস্তি পাইলাম! তাহার মন ফিরিতেছে, সংসারে মন বসিয়াছে। তাহার মুখে চোখে কেমন একটা তৃপ্তির চেহারা দেখিলাম, যেন কোথায় তাহার মত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কেন ঘটিয়াছে, কে ঘটাইল, তাহা আর কল্পনা করিব না; কিন্তু প্রচলনের সহিত নিজের সামঞ্জস্য করিয়া সে যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছে মনে হইল।

বিদ্রোহ শান্ত হইয়াছে। ইহাই নিয়ম, ইহাই শৃঙ্খলা তরঙ্গ নাই, ঘূর্ণি নাই, প্রবাহটা অনাহত। সেই প্রবাহে বিজন চিরদিনের মতো ভাসিয়া চলিল, আর সে প্রতিবাদ করিবে না। সংসার তাহাকে একটা বিচিত্র ছাঁচে ঢালিয়া নিজের মতো করিয়া লইল; বিজনের আর কোনো ত্রুটি নাই।

মাসখানেক পরে ভোরবেলায় আমার ঘরে আসিয়া বিজন কহিল, 'নমস্কার, শুভসংবাদ একটা দিতে এলুম।'

তাহার মুখের দিকে তাকাইলাম। সে হাসিমুখে কহিল,

'একটি নতুন অতিথি এসেছে আমাদের বাড়ীতে, আজ রাতে আপনার নেমন্তন্ন।'

হাসিয়া আমিও বলিলাম, 'ওঃ আপনার স্ত্রীর—ছেলে, না মেয়ে?'

সলজ্জ হাস্যে বিজন কেবল কহিল, 'ছেলে।'

*

* *

সোনাগাঁ হইতে সাত ক্রোশ গোরুর গাড়ী। মাঝে মাঝে বাঁশ আর খেঁজুরের জঙ্গল, মাঝে মাঝে মাঠ—শীতের মাঝামাঝি, এখনও ক্ষেত হইতে ধান উঠে নাই। সবেমাত্র ইতুপূজা ও নবান্ন শেষ হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে ছোটবড় উৎসব লাগিয়াই ছিল।

ডিস্টি্ক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ী অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছে, পথে দুই একটা শুক্‌নো নদী পড়িয়াছিল, তাহারই কাছাকাছি পানীয় জল আমরা সবাই পাইয়াছিলাম। দুপুরের রৌদ্র, দিগন্তজোড়া মাঠ, শীতের স্নিগ্ধ হাওয়া, গাছে গাছে পাখীর কলরব,—ইহাদের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া পথ আমাদের ফুরাইয়া আসিতেছিল।

ছয়খানা গোরুর গাড়ীতে আমরা সবসুদ্ধ ষোলটি মানুষ। আমার গাড়ীতে আমি ছিলাম একা। আমাদের গ্রামের বড়বউ এবং তাঁহার আত্মীয়স্বজন আগের গাড়ীগুলিতে চলিয়াছেন।

তাঁহার কাছে আমরা সকলে আমাদের পথ-খরচ জমা রাখিয়াছি। তিনি আমাদের কর্ত্রী। তাঁহার উপর মাথা তুলিয়া কেহ কথা বলিতে পারিব না, এই নিয়ম-নীতি মানিতেই হইবে।

শেষের গাড়ীতে কুসুম তাহার বুড়ো বাপকে লইয়া চলিয়াছে। বৃদ্ধের বাতের ব্যারাম, পক্ষাঘাতের লক্ষণ। বাবা যজ্ঞেশ্বরের মাতুলী লইলে বৃদ্ধ সারিয়া উঠিতে পারে এই আশায় কুসুম তাহাকে লইয়া তীর্থ করিতে চলিয়াছে। এতদিন সঙ্গী পাওয়া যায় নাই বলিয়া মনের প্রার্থনা মনেই ছিল। গাড়ীর ভিতরে বৃদ্ধ মড়ার মতো পড়িয়া আছে।

ছইয়ের ভিতর হইতে এক সময় গলা বাড়াইয়া কুসুম কহিল, 'আমি ত কোনো দোষ করিনি। আমার অন্যায়টা কি হোলো?'

আমার ঠিক পিছনেই তাহার গাড়ী। গোরু দুইটা অভ্যাস-মতো চলিতেছে, গাড়োয়ান কাৎ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মুখ বাড়াইয়া ইঙ্গিতে কুসুমকে চুপ করিতে বলিলাম। জানি তাহার প্রতিবাদে ফল হইবে না, অশান্তিই বাড়িবে।

কুসুম চুপ করিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বিনীত কণ্ঠে কথা কহিল, 'টাকা ক'টা ওঁর কাছে রাখতে গেলাম, উনি দিলেন গালমন্দ। উনি ব্রাহ্মণ, উনি বড়, আমি ওঁর পায়ের ধুলোর যুগ্যি নই।—তুমি বুঝি ওঁর আত্মীয়?'

বলিলাম, 'আমার এখানে কোন আত্মীয় নেই। ওঁরা পথ চেনেন না, আমি তাই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

কুসুম কহিল, 'তখন উনি জল খেলেন না কেন?'

আমাকে ইঙ্গিত করিয়া কুসুমকে থামাইতে হইল। ছেলেমানুষ বলিয়া তাহার কৌতূহল বেশী, সকল কথা প্রকাশ করিয়া না বলিলে সে বুঝিতে পারে না। রতনপুরে একটা কূয়া পাওয়া গিয়াছিল, সেই কূয়ার জল লইয়াই বিপত্তি। বাপের জন্য ঘটি নামাইয়া কুসুম জল লইয়াছিল, বড়বউ তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। মুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু নিজে তিনি তৃষ্ণা চাপিয়া রহিলেন। তাঁহার সেই গম্ভীর কঠিন মুখ দেখিয়া আমরা আর তাঁহার সহিত কথা বলিতে সাহস করি নাই।

কুসুম আবার যেন কি বলিতে গেল, আমি চটিয়া উঠিলাম। বলিলাম, 'সব কথা তুমি শুনবে এমন অধিকার তোমার নেই। ব্রাহ্মণের মেয়ে যদি যেখানে সেখানে জল না খেয়ে থাকেন তবে তোমাকে তার কৈফিয়ৎ দিতে যাবেন কেন?'

কুসুম তিরস্কারে একটুও দমিল না। কেবল কহিল, 'আমি ছোটলোক, আমার বাপ ছোট জাত, মারলেও কথা বলা উচিত নয়।'

'এত যদি জানো তবে চুপ ক'রে থাকো। তুমি যে ওঁর সঙ্গে যেতে পাচ্ছো এও কি তোমার কম লাভ?'

কুসুম চুপ করিয়া গেল।

মোচাখোলা পার হইয়া আমাদের গাড়ীগুলি একটা রেলপথের লেবেল্‌ক্রসিংয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী চলিয়া গেলে তবে ঠিকাদার লোহার গেট্ তুলিয়া ধরিবে। দূরে সিগ্‌নাল ডাউন হইয়াছে। শীতের বেলা। তিনটা বাজিতেই রৌদ্র আল্‌গা হইয়া আসিতেছিল। ধূলা জড়াইয়া

মাঠে মাঠে রুক্ষ ঠাণ্ডা হাওয়া এদিক ওদিক ফিরিতেছে। পিছনের গাড়ী হইতে কুসুম পুনরায় প্রশ্ন করিল, 'রাস্তা আর কত বাকি ?'

সকাল হইতে সমস্ত পথটা তাহার প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হায়রান হইয়াছি। মানুষের বিরক্তি সে বুঝেতে পারে না, সে মনে করে পৃথিবীর সবাই বুঝি তাহারই মতো কৌতূহলী, তাহারই মতো নিশ্চিন্ত; তাহার প্রশ্নের জবাব দেওয়া ছাড়া মানুষের আর কোনো কাজ নাই। অনেক কষ্টে সংযত কণ্ঠে কহিলাম, 'কোশ খানেক আর আছে। ছটফট্ করলে পথ ফুরোয় না।'

'বাবা, এখনো এক কোশ ? পথ ভুল করোনি ত ?' কুসুম কহিল।

তাহার দিকে তাকাইলাম। বলিলাম, 'সোজা পথটা তুমি দেখিয়ে দিলেই পারতে!'

কুসুম বুঝতে পারিল, আমি রাগ করিয়াছি। তবু কহিল, 'ওমা, মেয়েমানুষ বুঝি আবার পথ চেনে ? কে জানে কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছি। আমি অত বুঝিনে।'

'সুতরাং চুপ ক'রে থাকো।'

কুসুম কহিল, 'বেলা গড়িয়ে এলো, পথে চোর-ডাকাত নেই ত ?'

বলিলাম, 'থাকলেই বা তোমার ভয় কি ?'

কুসুম হাসিয়া কহিল, 'ওমা, আমার আবার কি ভয়, পাহাড়ের আড়ালে আছি। তোমরা থাকতে আমার—'

'তবে চুপ ক'রে থাকো।'

এমন সময় হুস হুস শব্দে ট্রেন আসিয়া পার হইয়া গেল। ঠিকাদার আসিল, লোহার বেড়া তুলিয়া ধরিল, আমাদের গাড়ীগুলি একে একে পার হইয়া ওপারের গ্রামের পথ ধরিল।

পিছন ফিরিয়া একবার দেখিলাম, কুসুম তাহার বুড়া বাপের মুখে ঘটি হইতে জল খাওয়াইতেছে, আঁচল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিতেছে। গোরুর গাড়ীতে চড়ার পরিশ্রম আর সে সহ্য করিতে পারে না। মাদুলী পরাইয়া যাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা হইতেছে, পথের মাঝখানেই বুঝি তাহার প্রাণবায়ু বাহির হয়। বৃদ্ধকে আনা উচিত হয় নাই।

বলিলাম, 'ভালো আছে ত? তোমার বাবার কথা বলছি।'

কুসুম কহিল, 'ভালো আর মন্দ! প্রাণটা আছে এই যা।'

'পুরুষমানুষ একজনকে সঙ্গে আনতে পারলে না? ধরো যদি পথে কোনো বিপদ ঘটে? তুমি একা মেয়েমানুষ—'

'কে আর আছে!'—বলিয়া কুসুম ছইয়ের বাহিরে মাঠের দিকে একবার তাকাইল; পুনরায় কহিল, 'আছেন ভগবান, দুঃখীর আশ্রয়।' বলিয়া সে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কুসুমের বয়স কম নয়, বাইশ-চব্বিশ হইবে। অনেক কথাই তাহার সম্বন্ধে শুনিয়াছি, কিন্তু কোনো কথা বিশ্বাস করিবার মতো তাহার ভাবভঙ্গী দেখি নাই। নীতির মূল্য আমার জানা আছে সুতরাং সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিব না। কুসুম সংসার করে নাই এই পর্য্যন্তই আমি জানি। কিন্তু বড়বউয়ের ধারণা অন্যরূপ, কোনো যুবতী স্ত্রীলোককেই তিনি বিশ্বাস করেন না, কুসুমের

সম্পর্কে নানা কারণ দেখাইয়া তিনি তাহাকে এখানে আনিতে ঘোর আপত্তি দেখাইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত আমারই জন্য সে আসিতে পারিয়াছে। তাহার সকল ঝক্কি আমাকেই পোহাইতে হইবে। আমারই যত জ্বালা।

কুসুম কহিল, 'আর বোধ হয় দেরি নেই, কেমন? গোরুর গাড়ীর ধকলে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল। ধন্যি তীর্থ! আঃ অপরাধ নিয়ো না বাবা যজ্ঞেশ্বর'—বলিয়া পথের দিকে সে একটা প্রণাম জানাইল।

বলিলাম, 'এত আরামপ্রিয় হ'লে পুণ্য করা চলে না।'

ম্লান হাসিয়া কুসুম কহিল, 'আমার পুণ্যি তোমাদের পায়ের তলায়। বাবার মাদুলির জন্যেই আসা, নইলে—'

'নইলে কি?'

'তুমি শুনলে রাগ করবে ঠাকুরমশাই, পুণ্যির লোভ আমার একটুও নেই, আমার দেবতা তোমরাই, তোমাদের স্যাবা করলেই আমি ধন্য। বাবা যজ্ঞেশ্বর আছেন আমার বুকের মধ্যে।'

বলিলাম, 'তবে চুপ ক'রে থাকো।'

কুসুম রাগ করিয়া কহিল, 'তোমার কেবল ওই এক কথা, আমি কি গোরু যে মুখ বুজে থাকব? ঠাকুরমশাই, তোমার মেজাজ দেখছি ভারী গরম! সঙ্গে এনে মাথা কিনেছ, কেমন? বলে—'নিজের নেবো, নিজের খাবো, কেবল মাত্তর সঙ্গে যাবো।' তোমার গায়ে বড়োমা'র হাওয়া লেগেছে!'

হাসিয়া বলিলাম, 'বড়বউয়ের ওপর এত রাগ কেন তোমার? ব্রাহ্মণের মেয়ে ব'লে?'

কুসুম জিব কাটিল। বলিল, 'ওমা, শোনো কথা। রাগ করব ঠাকুরের ওপর? সাত জন্ম নরকবাস হবে যে! বলছিলুম, আমার বড্ড জ্বর হয়েছে, বোধ হয় আমারই মেজাজ ভালো নেই—গাড়ী থেকে নামলে বাঁচি।'

'জ্বর হয়েছে? কই, আগে বলোনি ত?'

'পথে এসে জ্বর হলো।'

দুশ্চিন্তায় পড়িলাম। অসুখ বাড়িলে চিকিৎসা করিবার সুবিধা নাই, মহকুমা শহর এখান হইতে অনেক দূরে। যজ্ঞেশ্বর গ্রামে আশ্রয় বলিতে কোথাও কিছু নাই, দুই-একটা হোগলার চালা আছে, তাহাতেই কোনো মতে তিন রাত্রি বাস করিতে হইবে। যদি আগে হইতে সেখানে যাত্রীর ভিড় হইয়া থাকে তবে হোগলার চালাও না মিলিতে পারে। সম্মুখে শীতের রাত্রি, মাঠের কন্‌কনে বাতাস, গ্রামের অন্ধকারে কাহার কিরূপ ব্যবস্থা হইবে তাহাও এক সমস্যা—ইহার ভিতরে রোগীর কোনো সুব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়। কুসুমের উপর এইবার সত্যই রাগ হইল।

বলিলাম, 'বাপ অকর্ম্মণ্য, তার ওপর তোমার জ্বর, আমাদের কী বিপদে ফেললে বলো ত? দেখবে কে তোমাদের?'

যজ্ঞেশ্বর গ্রাম আসিয়া পড়িয়াছে, দূরে মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাইতেছিল। দুই-একটা টিম্‌টিমে আলো ইহারই মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বেলা সাড়ে পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। সেইদিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া কুসুম কহিল, 'দেখবেন তিনিই যিনি দেখবার মালিক!'

রুষ্টকণ্ঠে কহিলাম, ‘কে তিনি বলো? আমি, না ভগবান? কোন্ দুর্ভাগা?’

কুসুম কহিল, ‘তুমি ব্রাহ্মণ, তুমিই আমাদের ঠাকুর।’

কথায় কথায় তাহার এই প্রগাঢ় ভক্তির আতিশয্য, ইহা তাহার বিদ্রূপ অথবা আন্তরিক বিশ্বাস, তাহা এখনও আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ছোটজাতের ভিতরে আজকাল বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা। নিকটে দুই-চারিটি তালগাছ ঘেরা একটি জলাশয়। সম্মুখে প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরের দেবতা বিশেষ জাগ্রত, ইহা বাংলার বিখ্যাত তীর্থ। কয়েকদিন আগে মেলা হইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্ন এখানে ওখানে বর্ত্তমান। আমাদের সহিত এতগুলি যাত্রী দেখিয়া পাণ্ডা আসিয়া দাঁড়াইল। বড়বউ আসিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, ‘তুমি সরো, যা বলতে হয় আমি বলছি। তিনি বেঁচে থাকতে আমার অনেক দেশ বেড়ানো আছে। আমাকে সাধারণ মনে ক’রো না।’

আমি সরিয়া গেলাম। বড়বউয়ের গলার আওয়াজে যে দম্ভ প্রকাশ পাইল তাহা আমার পরিচিত। তাঁহার স্বামী ছিলেন রায়বাহাদুর, অনেক সম্পত্তির মালিক, তেজারতি ব্যবসায় ছিল তাঁহার—তিনি অনেক দেখিয়াছেন। পাণ্ডাঠাকুরের সহিত আলাপ করিয়া তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন যে, আতপ চাল, জ্বালানি কাঠ ও কিছু সব্জি পাওয়া যাইবে এবং যে হোগলার চালাটা এখনো কাৎ হইয়া কোনো মতে দাঁড়াইয়া আছে সেটি

বড়বউ নিজে তাঁহার বোনপোকে লইয়া দখল করিবেন। আমরা সবাই এই ব্যবস্থা দেখিয়া চুপ করিয়া গেলাম, কারণ বড়বউয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য না দেখিলে আমাদের উপায় নাই। প্রথমতঃ তাঁহার স্বামী ছিলেন রায়বাহাদুর, তিনি ডেপুটি-গিন্নী; দ্বিতীয়তঃ তিনি উচ্চকুলের ব্রাহ্মণ কন্যা; বিত্তশালিনী। তাঁহার বাড়ীতে মন্দির, ঠাকুরের গায়ে সোনা-রূপার গহনা, তাঁহার গোয়ালে গোরু, সিন্দুকে টাকা, কোম্পানীর কাগজ এবং পাটের কলে তাঁহার শেয়ার। বহু বহু তীর্থে তিনি গো-দান, ভূমি-দান, স্বর্ণ-দান করিয়া অপরিমেয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন। জীবনে তাঁহার কেবল একটিমাত্র দুঃখ এই যে, তাঁহার সন্তান নাই। যাহা হউক, আমরা চৌদ্দটি প্রাণী কেমন করিয়া কি ভাবে রাত্রিবাস করিব তাহা আহারাদির পরে ভাবিব, কিন্তু কুসুম ও তাহার বাপকে চালার ভিতরে না রাখিতে পারিলে বিপদ ঘটিবে এই মনে করিয়া আমি পুনরায় অগ্রসর হইয়া কহিলাম, 'দেখুন বড়মা, আপনি যদি পাণ্ডার বাড়ীতে জায়গা নেন্ তবে ভালো হয়। জায়গার বিশেষ অভাব ঘট্‌ছে।'

বড়বউ কহিলেন, 'কেন?'

বলিলাম, 'কুসুম আর ওর বাপকে চালার মধ্যে জায়গা দিতে হবে, ওদের বড় অসুখ।'

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বড়বউ বলিলেন, 'হুঁ। আমি কানা নই, বোকা নই, সবই স্বচক্ষে দেখেছি। সমস্ত পথটা পাশাপাশি গাড়ীতে ব'সে হাসি-তামাসা করতে করতে এসেছ। বুঝলুম তোমাকে, দেশে ফিরে গিয়ে সব বলব। নষ্ট-দুষ্টকে আমি দেবো জায়গা ছেড়ে?'

'কী বলছেন আপনি ?'

বড়বউ চীৎকার করিলেন,—'তুমি না বামুনের ছেলে ? তুমি না ডাকসাইটে বিদ্বান ? একটা ইতিজাতের মেয়ের সঙ্গে··· এই তোমার রুচি ? দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।'

বলিলাম, 'এটা বিদেশ, আপনি চেঁচাবেন না।'

'কান ভারি ক'রে দিয়েছে, কেমন ?'—বড়বউ বলিতেছিলেন, 'ওকালতি করতে এসেছে ওই একটা ঢলানে ছুঁড়ির পক্ষ নিয়ে ? আমার ত্রিসীমানায় আসতে মানা ক'রে দিয়ো, জায়গা আমি দিতে পারব না।'

জায়গা তিনি না দিন্ কিন্তু নিরপরাধ একটি মেয়ের চরিত্রের প্রতি এমন কদর্য্য কটাক্ষ, ইহা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া হজম করিতে হইল। তিনি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, বয়োজ্যেষ্ঠা, তাঁহার সম্মান আমাদেরই রাখিতে হইবে, তাঁহার দোষক্রটি ক্ষমা করিয়া চলিব—এই কথা ভাবিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। সংসারে আপোষ না করিয়া চলিলে উপায় নাই, অন্যায় ও অবিচারকে সহনযোগ্য না করিয়া লইলে অশান্তি বাড়িবে বই কমিবে না।

বুড়া বাপকে লইয়া কুসুম এক জায়গায় বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া অবাক হইতে হয়। সে কেবল পরিশ্রমী নয়, অত্যন্ত অস্থির আর চঞ্চল, এক জায়গায় তাহাকে কখনো বসিয়া থাকিতে দেখা যায় না। কিন্তু নূতন জায়গায় এমন ভাবে তাহাকে নিষ্ক্রিয় দেখিয়া চিন্তিত হইলাম। কহিলাম, 'কুসুম, তোমার জ্বর বুঝি বেড়েছে ?'

বুড়া বাপ কম্পিত হাতখানা তুলিয়া কন্যার মাথায় রাখিল। কুসুম কহিল, 'বেড়েছে যেন। আঃ—মাথায় বড় যন্ত্রণা।'

আশ্চর্য্য মানুষের মন। কাল হইতে এই মেয়েটির প্রতি সকলের অবজ্ঞা আর দুর্ব্যবহারের অন্ত নাই, ইহাকে অশুচি হিসাবে দেখিবার কেমন একটা আপ্রাণ চেষ্টা সকলের—অথচ ভিতরে ভিতরে ইহারই প্রতি আমার একটা অকারণ স্নেহ জমিয়া উঠিয়াছে। সকলে ইহার বিপক্ষে গিয়াছে—তাই বোধ করি ইহাকে মমতার আশ্রয় দিবার জন্য আমার মন লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ কি? কেন তাহার প্রতি আমি এমন সহৃদয় হইতেছি? সে একজন যুবতী স্ত্রীলোক বলিয়াই কি আমার এই পক্ষপাতিত্ব? কই, নিজের ভিতরে ত এখনও আসক্তির আভাস খুঁজিয়া পাই নাই! সে অবনত জাতির মেয়ে, তাহার প্রতি স্নেহ দেখাইয়া কি বর্ণহিন্দুর উদারতা দেখাইতেছি, আপন আভিজাত্য প্রকাশ করিতেছি? নয়ত কি পরোপকার করিয়া আত্মাভিমানকে তৃপ্ত করিতেছি? কিছুই বুঝিতে পারি না, কেবল এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল, তাহার অথবা তাহার পিতার কোনো বিপদ ঘটিলে আমিই সেজন্য দায়ী হইব, সে-কলঙ্ক আমাকেই স্পর্শ করিবে।

কাছে দাঁড়াইয়া কহিলাম, 'তোমাকে কিন্তু ওষুধ খেতে হবে কুসুম, জ্বরের ওষুধ আমার সঙ্গেই আছে।'

'বাবার মন্দিরে এসে ওষুধ খাবো?'—কুসুম দুর্ব্বল দেহে সরিয়া আসিয়া আমার পায়ের কাছে এক প্রণাম করিয়া কহিল,

'তোমাদের আশীর্ব্বাদেই সেরে উঠ্‌বো, ঠাকুরমশাই। ওষুধ আমি খাবো না।'

অনুরোধ মানিল না, দেখিতেছি আমাকে ভোগাইবে। কিন্তু এখন আর এদিকে নজর দিবার সময় নাই। আমার হাতেই সকলের আহারের ব্যবস্থা। তাহাদের নিকট হইতে পয়সা লইয়া বড়বউকে লুকাইয়া চিঁড়ে, মুড়কি ও দুধ সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। তাহাদের শুইবার জায়গা মন্দিরের ভিতর মিলিবে না, হোগলার চালাগুলি আমাদের দল পূর্ব্বেই অধিকার করিয়া লইয়াছে, ময়রার দোকানে জায়গা নাই, গ্রামের ঘরে কে রাত্রে জায়গা দিবে!—সাত-পাঁচ ভাবিয়া এক কৌশল আবিষ্কার করিলাম। গাছের নীচে ঠেকো দিয়া দুইখানি গরুর গাড়ী একত্র করিয়া এক অদ্ভুত উপায়ে আশ্রয় প্রস্তুত করা গেল। তিনটা রাত্রি কোনোরূপে তাহার ভিতরে পিতা ও কন্যার কাটিয়া যাইবে। সে-রাত্রে আমাকেও একখানা গাড়ীর ভিতরে জায়গা লইতে হইল। শীতকাল বলিয়াই বিপদ, গ্রীষ্ম হইলে আরাম পাওয়া যাইত।

যাত্রীর কলরবে সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিল। মেয়েরা স্নান সারিয়া পূজার আয়োজন করিতেছে। বড়বউ ডালা সাজাইতে-ছিলেন। পাণ্ডা অদূরে দাঁড়াইয়া পূজা-বিধি নির্দ্দেশ করিতেছিল।

হঠাৎ বড়বউ পিছন দিকে দেখিয়া হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'কী আক্কেল তোর কুসুম, এই কি পেন্নাম করবার সময়? চোখ পড়লো তোর, ডালাটা যে নষ্ট হয়ে গেল!

ভক্তিতে গদগদ, কে তোর পেন্নাম চেয়েছিল শুনি? পাণ্ডা-ঠাকুর, নূতন সাজ নিয়ে এসো, এ ডালা আমি যজ্ঞেশ্বরকে দিতে পারবো না, আমার অপরাধ হবে। বলি, এত ভক্তি কেন লা? কাল হাতে-নাতে ধরা পড়েছিলি কিনা, তাই ঘুষ দিয়ে খুশী করতে এলি, কেমন?'

কুসুম অপ্রস্তুত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, 'বুঝতে পারিনি বড়মা, আমি মনে করেছিলুম—'

পাশে রাঙাদিদি বসিয়াছিলেন, কহিলেন, 'কি মনে করেছিলি কুস্‌মি? ওলো, বয়েস হয়েছে আমাদের, কিন্তু কানা হইনি। দেখতেই পেলুম, শকুনি আকাশে উঠলেও ভাগাড়ে নজর রাখে!'

কুসুমের চোখে জল আসিয়াছিল, কহিল, 'আমি ওঁর আশীর্ব্বাদ চাইতে এসেছিলুম, উনি যে বড়!'

মাসীমা কহিলেন, 'মুখখানা তোর মিষ্টি, তাই এ-যাত্রা বেঁচে গেলি বাছা। অনিষ্ট ত করলি, এখন স'রে যা এখান থেকে।'

কুসুম সরিয়া যাইতেছিল, রাঙাদিদি কহিলেন, 'এই যেন মনে থাকে। আমাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ত এলি, মন্দিরে গিয়ে পুজোয় বসবো, তখন যেন হুম্ ক'রে গিয়ে হাজির হোসনে।'

বড়বউ কহিলেন, 'সঙ্গে এনেছি, কাল থেকে হাড় জ্বালিয়ে খেলে। জাতধম্ম নিয়ে এখন ওর সংস্রব এড়াতে পারলে বাঁচি। বলি ও কি, কোন্‌দিকে যাস লা?'

কুসুম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'পুকুরে।'

'পুকুরে ? ভারি তোর বুকের পাটা, না ? পুকুরের জল ছুঁয়ে আসবি, আমরা সবাই খাবো কি ? ধর্ম্মের ভয় নেই তোর ? পায়ের জুতো মাথায় উঠ্‌তে চায়, কেমন ? ওই ত আর একটা ডোবা আছে ওদিকে, যেতে পারিসনে ? গতর নেই ?'

কুসুম ভয়ে ভয়ে কহিল, 'ওটার জল নোংরা।'

সবাই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল,—'নোংরা ? কত ঢঙই দেখালি, কুসুম ! মোটে মা রাঁধে না, তায় পান্তা আর তপ্ত ! পেলি এই খুব, আবার নোংরা ! তুই জাতটা কি শুনি ? বল্‌ দেখি সবার সামনে দাঁড়িয়ে ?'

কুসুম চলিয়া গেল। আমার মাথা হেঁট হইল।

পাণ্ডাঠাকুর পুনরায় আসিয়া দাঁড়াইল। আমি কহিলাম, 'ঠাকুর, পুজো কখন্‌ হবে ?'

বড়বউ কহিলেন, 'তোমার আর সেজন্য মাথাব্যথা কী বলো, পুজো ত আমাদের। তুমি পুরুষমানুষ, জল-টল খেয়ে বেড়িয়ে বেড়াওগে। খাবার সময় ডাক্‌বে এরা।'

রাঙাদিদি কহিলেন, 'চুলের টিকি ত তোমার দেখবার জো নেই, এখন যে এলে খবর নিতে ? মতলব কি ?'

বলিলাম, 'আমার নিজের কোনো কাজ নেই ; পুজোর সময় কুসুম ওর বাপের মাদুলিটা যজ্ঞেশ্বরকে ছুঁইয়ে নেবে তাই বলছিলুম। আপনাদের পুজো কখন্‌ ?'

বড়বউ হাতের কাজ ফেলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। কহিলেন, 'কি বলছো ? কা'র মাদুলি কা'কে ছোঁয়াবে ?'

বলিলাম, 'কুসুম ওর বাপের জন্য মাতুলিটা—'

বড়বউ হুঙ্কার দিলেন। কহিলেন, 'পুজোটা ত কুসুমের বাপের পয়সায় হচ্ছে না, এক পোঁটলা টাকা নিয়ে আমি এসেছি তীর্থে, পুজোটা আমাব। যতক্ষণ আমার টাকায় পুজো ততক্ষণ আমার ঠাকুর—'

পাণ্ডা কহিল, 'বটেই ত, মা আমার বড় উঁচু ঘবেব মেয়ে।'

'আমার পুজোব সময় ওর মাতুলি ছোঁয়াতে দেবো?'—বড়-বউ চীৎকাব করিতে লাগিলেন, 'পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা, কেমন? বলো গে যাও তোমার পেয়ারের কুসুমকে, ভণ্ডামি কবলে ঠাকুরেব দয়া হয় না, মনের ময়লা তুলে ফেলতে হয়। বাবা যজ্ঞেশ্বর ফাঁকি সইবেন না!'

বাঙাদিদি আব মাসীমা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'দেখলে পাণ্ডাঠাকুর, জাতসাপ এনেছি সঙ্গে, বড়বউ আমাদের খোঁদি-পেঁচিব ঘরের মেয়ে নয়, দেখলে?'

পাণ্ডা ঘাড় নাড়িয়া হাত কচ্‌লাইয়া কহিল, 'বটেই ত।'

আমাব দিকে ফিরিয়া ফস করিয়া পঞ্চুর মা কহিল, 'তুমি ত দেখছি বাছা ঘরের শত্তুর বিভীষণ! টাকা খরচ ক'রে বড়বউ তোমাকে নিয়ে এলেন, তুমি দলছাড়া হ'য়ে ছোটজাতের দলে গিয়ে ভিড়লে? এ তোমার কেমন রীত, বাবা?'

আমি জানি, ইহারাও তিন-চারজনে বড়বউয়ের টাকায় তীর্থ করিতে আসিয়াছে, চাটুবাক্য শোনানো ছাড়া ইহাদের আর কোনো লক্ষ্য নাই—ইহা জানিয়াও আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কী বলিব? কী বলিয়া বুঝাইব, মনুষ্যত্বকে মারিয়া তীর্থধর্ম্ম হয় না।

কিন্তু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মাসীমা পঞ্চুর মার কথার জবাব দিলেন—'এই ক'রেই ত বাঙালী জাতটা উচ্ছন্নে গেল !'

ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। চালার পাশ দিয়া আসিয়া ডোবাটা পার হইয়া অদূরে কুসুমকে দেখা গেল। গোরুর গাড়ীর একখানা চাকার গোড়ায় বুড়া বাপকে লইয়া সে ছোট একটা ঘরকন্না পাতিয়াছে। কিন্তু কাছে গিয়া দেখিলাম সে কাঁপিতেছে, জ্বরে সে পুড়িয়া যাইতেছে, গলার আওয়াজে মনে হইল বুকে সর্দ্দি বসিয়াছে। কাছে আসিতেই সে মুখ তুলিল, দেখিলাম তাহার গাল বাহিয়া অশ্রু নামিয়াছে। বলিলাম, 'কুসুম, কাঁদো কেন ? কি হলো ?'

কুসুম অশ্রুজড়িত কণ্ঠে জানাইল, ডোবার জল লইয়া সে অতি কষ্টে ফিরিতেছে, এমন সময় অসাবধানবশত তাহার ছায়াটা মানদাদিদির গায়ে পড়িয়া গিয়াছিল—মানদাদিদি অকথ্য অপমান করিয়া তাহাকে মারিতে আসিলেন। বড়মা'র বোনপো তাহার পিঠে খানিকটা কাদা ছুড়িয়া দিয়াছে।

তাহার বুড়া বাপ শীর্ণকণ্ঠে ম্লান হাসিয়া কহিল, 'ঠাকুরমশাই, ওর মনে থাকে না যে ও ছোটজাত। ছেলেমানুষ কিনা, তাই অপমানটা এখনো গায়ে লাগে। থাম্ বাবা থাম্, হিসেব ক'রে চল্।'

আমি হাত নাড়িয়া হাসিয়া বলিলাম, 'আরে এ আর কতটুকু ? শক্তিমান করেছে অত্যাচার দুর্ব্বলের ওপর। অতি সাধারণ কথা। বেশ, আমাকে বামুনের ছেলে ব'লে মানো ত ? এই আমি গলবস্ত্র হ'য়ে তোমার কাছে—বলি ও কুসুমসুন্দরী—'

দুর্ব্বল দেহে কুসুম হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, 'কী করছ, অপরাধ হবে যে আমার, ও ঠাকুরমশাই ?'

আমি কৌতুক অভিনয় করিয়া কহিলাম, 'হে কুসুমসুন্দরী, দেবতা সাক্ষী করিয়া আমি তোমাকে এই অভিশাপ দিই যে যে, পরজন্মে তুমি এক সনাতন হিন্দু-পরিবারে বড়বউরূপে জন্মগ্রহণ করিবে !'

'ওমা, ও-কথা ভাবলেও যে আমার পাপ হবে, ঠাকুরমশাই ?' —বলিয়া কুসুম তাড়াতাড়ি মাটিতে মাথা নোয়াইয়া আমাকে প্রণাম করিল। কহিল, 'সকলের পায়ের তলায় থাক্‌ব, সবাই আমাকে মাড়িয়ে যাবে, সেই আমার অক্ষয় পুণ্য ঠাকুর।'

'তোমার মুণ্ডু।' বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

কুসুমের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া আমি প্রায় একঘরে হইয়া আছি। বাস্তবিক দলছাড়া হইয়া অন্য দলে গিয়া ভিড়িলে মানুষের একটু লাগে বৈকি। পঞ্চুর মা ঠিকই বলিয়াছে। দলাদলি করিয়াই বাঙলা দেশের যত অধঃপতন ! আর যাহাই হউক, বড়বউ গাড়ী ভাড়া দিয়া আনিয়াছেন। নিজের অপরাধটা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি। কিন্তু এত করিয়াও কুসুমকে একপান্‌ ঔষধ খাওয়াইতে পারিলাম না। তীর্থস্থানে ঔষধ স্পর্শ করিতে নাই, দেবতার প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়—এই বলিয়া সেই যে কুসুম বাঁকিয়া বসিয়াছে, কাহার সাধ্য তাহার প্রতিজ্ঞা ভাঙে। আমি চিকিৎসক নই, অসুখ তাহার কতদূর বাড়িয়াছে, রোগ কতদূর গভীরে নামিয়াছে,

তাহা বলিতে পারিব না। কিন্তু ইহা দেখিতেছি, সে যেন জ্ঞান ও অজ্ঞানের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া কেমন হইয়া গিয়াছে, তাহার সকল কথার অর্থ বোঝা যায় না। সকলকে লুকাইয়া তাহার মাথায় একবার হাত দিয়া দেখিলাম—তাহা এত গরম যে, আমার হাতখানা কিছুক্ষণ ধরিয়া জ্বালা করিতে লাগিল। নিজে সে কিছু খাইবে না, বুড়া বাপ তাহাকে কিছু খাওয়াইতে অক্ষম। আমি বাটি ধরিয়া তাহাকে অনুরোধ করিতে পারি, কিন্তু যত্ন করিয়া তাহাকে খাওয়াইবার সাধ্য আমার নাই। তাহার সেবা করিবার জন্য নিকটের গ্রামে গিয়া একটি স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্তু মানদাদিদি তাহাকে কি যেন বলিল, সে আমাকে না বলিয়া পলাইয়া গেল। কুসুম আমাকে এ-যাত্রায় বেশ জব্দ করিল দেখিতেছি। আশ্চর্য্য, নিজের মাথাব্যথা দেখিয়া নিজেই অবাক হইয়া যাই। পরের জন্য ভাবা, পরের সেবা করিবার আগ্রহ আমার কোষ্ঠিতে লিখে নাই—কুসুম যেন আমাকে হঠাৎ নূতন ছাঁচে ঢালিয়া এক অদ্ভুত জারক রসে একটু একটু করিয়া পাকাইয়া লইয়াছে। এই নীচজাতির মেয়েটা যেন আমার উপর অকারণ অসহ্য উপদ্রব করিতে সুরু করিয়াছে; তাহার যতকিছু অভাব-অভিযোগ, যতকিছু তাহার ইহজগতের দেনা-পাওনা যেন আমার উপর দিয়া সব মিটাইতে চায়। আজ তৃতীয় দিন, কাল সকালে দেশে যাত্রা করিবার পালা, কিন্তু পুনরায় গোরুর গাড়ীর ধকল কুসুম কেমন করিয়া সহ্য করিবে? তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার কথা ভাবিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম।

আমাদের কাজ আর কিছু বাকি নাই, পূজা-আর্চ্চা, মানৎ, দান-পুণ্য সবই শেষ হইয়া গিয়াছে। কুসুমের বুড়ো বাপ মাহুলি পাইয়াছে, পাণ্ডার মোটা দক্ষিণা মিলিয়াছে—এবার রাত্রি প্রভাত হইলেই আমরা গাড়ীতে উঠিব। বিছানাপত্র বাদ দিয়া পুঁটলি-পোঁটলা বাঁধা হইতেছে।

সন্ধ্যার দিকে পাণ্ডাঠাকুর মোটা মোটা কয়েকখানা বই লইয়া হাজির হইল। যাইবার আগে 'কথা' শুনিতে হয়, তারপর 'সুফল' করিতে হইবে, তারপর ঠাকুরের প্রসাদ মিলিবে। শালগ্রাম সঙ্গেই ছিল, পাণ্ডাঠাকুর নামাবলী পাতিয়া আসর প্রস্তুত করিল। আমরা সবাই মিলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া গেলাম।

তিন-চারিটা হারিকেন্-লণ্ঠন আমাদের সঙ্গে ছিল, সেগুলি জ্বালাইয়া মন্দিরের বহিঃচত্বরে সতরঞ্চি ও কম্বল পাতিয়া আসর বসিল। প্রধান শ্রোত্রী বড়বউ, তাঁহাকে ঘিরিয়া কয়েকজন গ্রহ-উপগ্রহ। একা বড়বউ 'নামের' রসাস্বাদন করিতে পারিলেই হইল, আর যদি কেহ বুঝিতে না পারে তবে সে চুপ করিয়া থাকিবে, উচ্চবাচ্য করিবে না। তিনি এমন করিয়া বসিলেন যেন এই মন্দির তাঁহার স্বামী রায়বাহাদুরের সম্পত্তি, আমরা সবাই তাঁহার অনুগত প্রজা, পাণ্ডাঠাকুর তাঁহার ক্রীতদাস। বাবা যজ্ঞেশ্বর জাগ্রত দেবতা, তিনি যদি প্রসন্ন হন্ তবে বড়বউয়েরই প্রতি হইবেন, পুণ্য বলিয়া যদি কোনো বস্তু থাকে তবে তাহা বড়বউই লাভ করিবেন, একথা আমরা সবাই জানি। দেবলোকের সকল রহস্য যেন বড়বউয়ের করতলগত, তাঁহার মুখের চেহারা যেন অনেকটা এমনই।

গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা চত্বরের নীচে আসিয়া বসিয়াছে। তাহাদের একান্তে একটি হারিকেন্-লণ্ঠন মুখের কাছে রাখিয়া শ্রীমতী কুসুমসুন্দরী তাহার রোগজর্জ্জর দেহ লইয়া মরিতে মরিতে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। বসিবার সাধ্য তাহার নাই, মাঝে মাঝে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, তবু তাহার 'নামবন্দনা' শুনিয়া যাওয়া চাই। ছোটজাত, তাই পুণ্যের প্রতি তাহার এত লালসা। বোধ হয় ভাবিতেছে, এজন্মে ফাঁকি দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া পরজন্মে সনাতন হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবে। পঞ্চুর মা তাহাকে দেখিয়া রাঙাদিদির গা টিপিয়া মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিলেন। মাসীমা চুপি চুপি কহিলেন, 'গ্যাখ্ ভাই গ্যাখ্ মানদা, ছুঁড়ির চোখ যেন বন-বিড়ালের মত জ্বল্ছে। তবু ভালো যে ধর্ম্মে মতি হয়েছে এতক্ষণে।'

পঞ্চুর মা কহিল, 'ও বড়বউ, ভাগ্যি তুমি এসেছিলে মা, তোমার পয়সায় অনেক পাপী উদ্ধার হোলো।'

পাণ্ডা তখন বলিতেছিল, কবে কোন্ মুনি কি যেন অসাধ্য সাধন করিবার তপস্যায় এইখানে বসিয়াছিল, এমন সময় আকাশপথে যাইতেছিলেন ভোলা মহেশ্বব, মুনির তপস্যায় খুশী হইয়া তিনি আসিয়া দেখা দিলেন। মুনি বর প্রার্থনা করিয়া কহিল, ঠাকুর, আমি শাপ-ভ্রষ্ট দেবতা, তোমার পথ চাহিয়া ছিলাম, আমাকে উদ্ধার করো। পতিতপাবন মহেশ্বর তাহার প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া বর দিলেন। মুনি দিব্যদেহ ধারণ করিয়া স্বর্গের পথে চলিয়া গেল। সেই হইতে নিকটের ওই পুষ্করিণীর নাম

হইয়াছে 'পতিতপাবন কুণ্ড।' ওখানে স্নান ও পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডদান করিলে পাপক্ষালন হয়। এই মহাতীর্থে যে ভাগ্যবানের মৃত্যু ঘটে, সে গোলকধামে গিয়া মোক্ষলাভ করে।

বড়বউয়ের চক্ষে আনন্দাশ্রু ঝরিতেছিল, তাঁহার সঙ্গিনীরা আঁচলে চক্ষু মুছিতেছে। কুসুমের দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, সে মাটিতে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিতেছে; প্রণাম আর তাহার শেষ হয় না। দেখিয়া আমার রাগ হইল। বিকালবেলা তাহাকে মানা করিয়াছিলাম সে যেন নড়াচড়া না করে, তবু সে কাঁথা মুড়ি দিয়া বাহিরের এই ঠাণ্ডায় দুই ঘণ্টা কাটাইতেছে। অবুঝ, অবাধ্য, অশিক্ষিত ছোটজাত, তাহাকে আস্কারা দিয়া অন্যায় করিয়াছি, আর তাহাকে আমি সাধ্য-সাধনা করিতে পারিব না। সে গোল্লায় যাক্।

সকলে 'সুফল' করিল, পাণ্ডার আশীর্ব্বাদ লইল, প্রসাদ গ্রহণ করিল। বড়বউ অনেকগুলি টাকা পাণ্ডাকে প্রণামী দিলেন। একখানা মোটা খাতায় সকলের নাম, ঠিকানা ও বংশের তালিকা লেখা হইল। আমার কিন্তু তখন নজর ছিল কুসুমের দিকে। ইহাদের সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যদি তাহাকে উঠিয়া গিয়া শুইয়া পড়িবার জন্য অনুরোধ করি তবে তাহা বিসদৃশ হইবে। তাহার প্রতি আমার দরদ বিন্দুমাত্র প্রকাশ হইয়া পড়িলে কানাকানি হাসাহাসির আর অন্ত থাকিবে না। তাহাতে আমার জ্বালা বাড়িবে, কুসুমের যন্ত্রণা বাড়িবে। মেয়েরাই মেয়েদের চরিত্রকে দূষিত বলিয়া প্রচার করিবার যত চেষ্টা করে, এমন পুরুষে করে না। ইহাদের নিজেদের ভিতর

সহমর্ম্মিতা নাই, সংসারে কোনো বড় কাজ তাই ইহারা করিতে পারে না।

চাহিয়া দেখিলাম, কুসুম কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। এখনি হয়ত সে টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া যাইবে। ভাবিলাম তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলি। কিন্তু পারিলাম না, ইহাদের সকলের দিকে একবার চাহিয়া নিজেকে সংযত করিলাম। কুসুম অগ্রসর হইয়া চত্বরের উপর মাথা ঠেকাইয়া উপস্থিত সকলের উদ্দেশে প্রণাম করিল। আমাদের দেবতা যজ্ঞেশ্বর, কিন্তু কুসুমের দেবতা আমরা সকলে। আমাদের পায়ের কাছে পড়িয়া যদি তাহার এই মুহূর্ত্তে হার্ট্-ফেল করে, তবে সে গোলকধামে গিয়া মোক্ষলাভ করিবে। বড়বউ এবং আর সকলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গর্ব্বসুখে গদগদ হইয়া হাসিমুখে কহিলেন, 'সুমতি হোক বাছা তোর, সুমতি হোক। ধর্ম্মপথে থাকিস, পরের জন্মে বামুনের পায়ের ধূলো তোর জুটবে। ও আবার কি লা? টাকা বা'র করিস্ কেন?'

কুসুম কম্পিতকণ্ঠে কহিল, 'পাণ্ডাঠাকুরের প্রণামী, বড়মা।'

সকলের মুখের চেহারা তৎক্ষণাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। রাঙাদিদি কহিলেন, 'ধন্যি মেয়ে তুই। কিছুতেই হার মানবিনে, কেমন? এলি আমাদের ওপর টেক্কা দিতে, এই ত? কিন্তু তোর টাকা পাণ্ডাঠাকুর নেবে কেন? কত ন্যাকাপনাই দেখালি কুস্‌মি!'

বড়বউ কহিলেন, 'পুণ্যিতে আর কাজ নেই, ওই টাকায় বাপের ওষুধ কিনে দিস। যা, পালা এখান থেকে।'

টাকাটা মুঠোর মধ্যে রাখিয়া কুসুম হারিকেন্-লণ্ঠনটা হাতে লইয়া টলিতে টলিতে ফিরিয়া গেল।

শীতের ঠাণ্ডায় আর বসা চলে না, সকলে একে একে উঠিয়া যাইবার পর আমি গ্রামের দিকে হাঁটা দিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, গোরুর গাড়ীর ভিতরে কাঁথা মুড়ি দিয়া কুসুম শুইয়া আছে। অকর্ম্মণ্য বুড়ো বাপ তাহার কোনো সাহায্যেই লাগে নাই, কম্বল মুড়ি দিয়া গাড়ীর চাকার পাশে শুইয়া খক্ খক্ করিয়া কাশিতেছে। মাদুলি পাইয়া বুড়ো বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। আজ সকালে তাহাকে ভাত, ছানা আর বাদাম খাওয়াইয়াছি। কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কন্যার পিতাকে ঘুষ দিয়া খুশী রাখিতেছি—বুড়ো এই কথা ভাবিতেছে কিনা কে জানে! অভিজাত সমাজের লেখাপড়া জানা লোক হইলে এতক্ষণ আমার 'সাইকোলজি' ঘাঁটিয়া আমাকে কুকুর বানাইয়া ছাড়িত।

মাথার কাছে গিয়া ডাকিলাম, 'কুসুম?'

তাহার গলার ভিতর দিয়া একরূপ অদ্ভুত শব্দ বাহির হইতেছে। সে সাড়া দিল না। আবার ডাকিলাম, 'কুসুমসুন্দরী, গরম দুধ এনেছি, খেয়ে ফেলো।'

এইবার সে সাড়া দিল, কহিল, 'দুধ আমি খাবো না, ঠাকুরমশাই।'

'বিলক্ষণ! খাবে বৈকি, অনেক দূর থেকে এনেছি, লক্ষ্মী দিদি আমার, এটুকু খাও। তুমি কাঁদছো বুঝি?'

মেয়েটা বড় একগুঁয়ে, কথা কহিল না। আমি একবার পিছনের অন্ধকার রাত্রির দিকে তাকাইলাম। তারপর পুনরায়

কহিলাম, 'কুসুম, তোমার বয়স খারাপ, এখানে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ সাধাসাধি করাটা ভালো দেখাবে না, উঠে খেয়ে নাও।'

এইবার সে উঠিল। কহিল, 'আচ্ছা খাবো, তুমি রেখে যাও। ঠাকুরমশাই, দাঁড়াও একটু, আর একটা কথা'—বলিতে বলিতে অতি কষ্টে সে গাড়ী হইতে নামিল। তারপর একটা পুঁটলি এলাইয়া একখানা বৃন্দাবনী সূতী শাল বাহির করিল। আমার পায়ের কাছে শালখানা রাখিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, 'অনেক করেছ তুমি, বড় সাধ এইখানা তোমাকে প্রণামী দেবো। আমার সঙ্গে আর কিছু নেই, থাক্‌লে—'

হাসিয়া কহিলাম, 'আমার যে জাত নষ্ট হবে, কুসুম।'

'তোমার জাত ? তুমি সব জাতের বাইরে, ঠাকুরমশাই।—' বলিতে বলিতেই কিন্তু কুসুম কাঁদিয়া ফেলিল, অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে লণ্ঠনের আলোয় মুখ তুলিয়া পুনরায় কহিল, 'ঠাকুরমশাই, তোমাদের অপমানেই আমি উদ্ধার হবো। নীচজাতের ঘরে জন্ম, তাই সকলের নীচে প'ড়ে আছি। কিন্তু···কিন্তু আর কোনো পাপ আমি এ জীবনে কখনো করিনি।'

শালখানা মাথায় জড়াইয়া লইলাম। মনের ভিতরে একটু আবেগ জমিয়া উঠিয়াছে, পাছে তাহা এই বালিকার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে এজন্য তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু পা বাড়াইতেই অন্ধকারে পাণ্ডাঠাকুর সাড়া দিয়া কহিল, 'বাবুমশাই, একটা কথা—'

বলিলাম, 'কি বলো ?'

'ওই মেয়েটি আমাকে প্রণামী দিতে চেয়েছিল। ওদের

সামনে নিতে পারিনি তখন·· হেঁ···হেঁ···যতই হোক আমরা গরীব। টাকাটা কি আপনি চেয়ে দেবেন? দয়া ক'রে যদি—'

কুসুম তৎক্ষণাৎ টলিতে টলিতে আসিয়া টাকা দিয়া তীর্থগুরুকে প্রণাম করিল। তিন দিন ধরিয়া দেখিলাম, এমন মানুষ নেই যাহার পায়ে কুসুম মাথা লুটাইল না। সে যেন মানুষের পায়ের ধূলার চেয়েও অধম! পাণ্ডা আল্‌গোছে তাহার হাতে একটু প্রসাদ দিল, কুসুম সেই প্রসাদ মাথায় তুলিয়া লইল।

দুইজনে ফিরিতেছি, দেখি অন্ধকারে আমার অলক্ষ্যে হাতের ঘটির জলে টাকাটা ধুইয়া লইয়া পাণ্ডা ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিল। বেচারা বড় গরীব!

মাঠের উপরেই কম্বল চাপা দিয়া পড়িয়াছিলাম। সকালবেলা গাড়োয়ানদের কোলাহলে ঘুম ভাঙিল। তখন সবেমাত্র ভোর হইতেছে। অন্ধকারের সহিত শীতের কুয়াশা জড়াইয়া আছে। এই ভোরেই আমাদের যাত্রা করিতে হইবে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম।

কিন্তু গাড়োয়ানগণের কোলাহলের সহিত রাঙাদিদি, মাসীমা, মানদা ও বড়বউয়ের চীৎকারে আমি যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলাম। তাহাদের সহিত কুসুমের বুড়ো বাপ তাহার বাত ও পক্ষঘাতগ্রস্ত দেহ লইয়া হাত-পা ছুড়িতেছে। কানে আসিল, কুসুমকে পাওয়া যাইতেছে না। রাত্রে উঠিয়া কুসুম গা ঢাকা দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। দুধের ঘটি তেমনই পড়িয়া আছে।

অবাক হইলাম। কুসুম কোথায় পলাইল? অত অসুখ লইয়া পলাইল কেমন করিয়া? তবে কি অসুখ তাহার মিথ্যা ছলনা? তবে কি স্ত্রীলোকের চরিত্র সৃষ্টিকর্ত্তারও অজ্ঞাত? ঘুমজড়ানো চোখে আমি যেন দিশাহারা হইয়া গেলাম।

কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই জানা গেল, কুসুম পলাইয়াছে বটে, তবে তাহার দেহটা খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে, বেশি দূর সে আমাদের কল্পনাকে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। সকলে গিয়া দেখিলাম, বাবা যজ্ঞেশ্বরের মূল মন্দিরের বন্ধ দরজার চৌকাঠে মাথা রাখিয়া শ্রীমতী কুসুমসুন্দরী ঘুমাইয়া আছে। ঠাকুরের চরণতলে যেন একটি শতদল ফুটিয়া রহিয়াছে। কুসুম পলাইয়াছে, সে ঘুম আর ভাঙবে না।

'মোক্ষলাভ হলো রে তোর, কুস্‌মি!—'একজন হঠাৎ বলিয়া উঠিল।

চমকিয়া চাহিলাম। কুসুমের দুইটি বিবর্ণ চক্ষু প্রভাতের শুকতারার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমিও সেইদিকে চাহিলাম, কোথায় মোক্ষ? কোথায় গোলকধাম? স্বর্গ কোন্ পথে? কোন্ পথ দিয়া কুসুম আমাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ জানাইবার জন্য ছুটিল? কোন্ পতিতপাবন কোথা হইতে তাহাকে ডাকিল?

আমার মাথায় বৃন্দাবনী শালখানা জড়ানোই ছিল। ভাবিলাম, আমার দেওয়া দুধটুকুও সে গ্রহণ করে নাই, আমি তাহার শাল লইব কেন? তৎক্ষণাৎ সেখানা খুলিয়া কুসুমের দেহ ঢাকিয়া দিলাম। তারপর উহাদের দিকে চাহিয়া বলিলাম,

আপনারা যাত্রা করুন, আমি ওর শেষের কাজ ক'রে বুড়ো বাপকে নিয়ে দেশে ফিরবো।

এতক্ষণ বড়বউ একটি কথাও বলেন নাই। নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তাঁহার চোখ কুসুমের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। নীচজাতীয়া মেয়েটা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া বৈকুণ্ঠলোকের পথে যাত্রা করিয়াছে সন্দেহ নাই। বড়বউয়ের চোখ ছুটা যেন প্রলুব্ধা হিংস্র বাঘিনীর মতো জ্বলিতেছিল; শৃগালী যেন ব্যাঘ্রীর শিকার লুণ্ঠন করিয়া পলাইয়াছে। কিন্তু আমার কথায় তাঁহার জ্ঞান ফিরিল, একটা অদ্ভুত বেদনা-ব্যাকুল আওয়াজ তাঁহার গলা দিয়া বাহির হইল। কহিলেন, 'যাক্, শেষ হয়ে গেছে।'

মানদা কহিল, 'হ্যাঁ বড়বউ, ছুঁড়ি আমাদের ওপর খুব টেক্কা দিয়ে গেল।'

*

* *

'বাঙালীর শিক্ষা, বাঙালীর সভ্যতা, বাঙালীর সংস্কৃতি একদিন সমগ্র ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছিল, আজো তার ব্যতিক্রম হবে না; আজো বাঙলার আকাশে, বাঙলার মাঠে, বাঙলার নদীতে নদীতে'—এমনি কিছু একটা গুছিয়ে লেখো না হে, একটা কলম্ অন্তত ভরিয়ে দেওয়া চাই, বুঝলে? রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, ফিরতে হবে। তোমার বৌদিদির জ্বর দেখে বেরিয়েছি—নাও, আরম্ভ ক'রে দাও।'—বলিয়া সম্পাদক

মহাশয় নিজের টেব্‌লে গিয়া বসিলেন।

কোন্ কথা দিয়া প্রথমে আরম্ভ করিব তাহাই বসিয়া ভাবিতেছিলাম। আমাব বিদ্যা সামান্য, কল্পনা যৎসামান্য, কিন্তু বাঙালীর যশ গাহিতে গেলে ইহাতেই চলিয়া যাইবে, এই মনে করিয়া শাদা কাগজ লইয়া বসিলাম।

'ও কি হে, প্রস্তবীভূত কেন?' সম্পাদক মহাশয় পুনরায় আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'উৎসাহ নেই, কেমন? কি করেই বা থাকবে বলো! বসে থাকতে পারোনি তাই ব্যাগাব খাটতে এসেছ কাগজের অফিসে। তিরিশ টাকা পেতে, তাও বন্ধ। যা বলি তাই শোনো, দুধে জল মিশিয়ে দাও, বুঝলে? কেউ ধরতে পারবে না। লেখো লেখো, আটের পৃষ্ঠাটা ভরাতে হবে ত।—হ্যাঁ, এই যে, কি চাই নবেনবাবু! কাপি? দিচ্ছি দাঁড়ান্,—আচ্ছা, পনেবো মিনিট বাদে আসবেন। লেখা আর আসছে না নরেনবাবু, বিজ্ঞাপনগুলো ছড়িয়ে সাজান, জায়গা ভবে যাবে।'

নরেনবাবু চলিয়া গেল। এইবাব দ্রুত আবস্ত কবিবার চেষ্টা কবিলাম। 'বাঙালীব শিক্ষা, বাঙালীর শিক্ষা, বাঙালীর সভ্যতা, বাঙালীব,—'কি চাই সুকুমাববাবু?

সুকুমার কহিল, 'ক্ষিতীশবাবুব মৃত্যু সংবাদটা—'

সম্পাদক কহিলেন, 'হ্যাঁ, তার ব্লকটাও দিয়ে দাও। 'ব্যানার টাইটেল' কিছু দরকার নেই। লিখে দিয়ো, 'সাংবাদিকের অকাল-মৃত্যু, পরলোকে ক্ষিতীশদাস।' কী রোগ যেন হয়েছিল তার? আমাদের এখানে প্রায় ছয় বছর চাকরি করেছিল, না হে সুকুমার?'

সুকুমার কহিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, যক্ষ্মায় মারা গেছেন। আপনি কি তার সম্বন্ধে সম্পাদকীয় লিখবেন?'

'কী লিখবো?'—সম্পাদক কহিলেন, 'কোনো অর্থ নেই, সুকুমার। আমরা কাগুজে লোক, যাদের কখনো চোখেও দেখিনি, যারা আমাদের একটি কানাকড়িও উপকার করেনি, তাদের মৃত্যুতে কাঁদি হাউ হাউ ক'রে; চোখের জলে কাগজ ভেসে যায়। শোক সংবাদ নিয়ে খেলা করি, অভিধান হাতে নিয়ে ভাবি কোন্ কথাটা বসালে বেশ করুণরস সৃষ্টি হবে। সুকুমার, সব মিথ্যে, সমস্ত ফাঁকি। হ্যাঁ, ক্ষিতীশের ওপর কিছু লেখা হবে না,—কেঁদে কী লাভ? ওসব আমি পারবো না ভাই, আন্তরিক দুঃখের কথা লেখা বড় কঠিন, রং চড়িয়ে লিখতে আমার লজ্জা করে। তুমি যাও।'

আমি তখন প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি। আরম্ভ করিলেই কলম আপনা হইতে চলিতে থাকে। তখন শুধু বাঙালী কেন, মেমেল্ অথবা লিলিপুটিয়ানদেরও ঐতিহ্য ইতিহাস অবাধে লিখিয়া যাইতে পারি।

সম্পাদক ফস ফস করিয়া তাঁহার কাগজে লিখিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে কখনো ভাবিতে দেখি নাই, কলমের ডগায় তাঁহার লেখা বসিয়া থাকে, ডাকিলেই আসে। লিখিতে লিখিতে এক সময়ে তিনি মুখ তুলিলেন, কহিলেন, 'ওহে, ও দাদু?'

তাঁহার দিকে ফিরিলাম। তিনি আকাশপাতাল ভাবিয়া হঠাৎ কহিলেন, 'ক্ষিতীশের চিকিৎসা কিছুই হয় নি, না হে?

চল্লিশ টাকা মাইনে নিয়ে সংসার চালানো কঠিন, তার ওপর এই ঘোড়া রোগ !'

বলিলাম, 'শেষের দিকে মাইনে সে পায়নি, বড়বাবু।'

'চুপ, চেঁচিয়ো না, সব মনে আছে। কে দেবে মাইনে, শুনি? ম্যানেজিং ডিরেক্‌টর কংগ্রেস নিয়ে ব্যস্ত। টাকা চাইলে তিনি দেনা দেখিয়ে দেন। সেদিন প্রেসের লোকেরা ধর্ম্মঘট করলো, তার জন্যে আমার লাঞ্ছনার আর অবধি রইলো না। আচ্ছা, তুমি জানো, ক্ষিতীশের স্ত্রীর প্রভিশনের কোনো বন্দোবস্ত আছে কিনা ?'

বলিলাম, 'গরীবের মেয়ে, স্বামী ছিল গরীব—'

'অর্থাৎ কিছু নেই, কেমন ? আহা, বেঁচে গেছে ছোক্‌রা, বড় দুঃখ পাচ্ছিল। কী নোংরা ঘরে থাক্‌ত ! আলো নেই, একটু হাওয়া নেই, একটু ভালো খাওয়া নেই,—দূর হোকগে, লিখে দাও, 'তার মৃত্যুতে 'স্বাধীনতা'-পত্রের সকল কর্ম্মীরা সবিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন! যে তিন মাসের মাহিনা তাঁহার বাকি আছে তাহা আদায় করিয়া ম্যানেজিং ডিরেক্‌টরের বৌদিদির সম্মানার্থে টি-পার্টি দেওয়া হইবে।' না কি বলো হে ? তুমি ত তার খুব বন্ধু ছিলে। ওই টেবল্‌টায় বসতো না সে ?'

বলিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওই যে এখনো পিঠের দাগ রয়েছে ; তার প্রিয় কলমটা, তার দোয়াত। ব্লটিংয়ের ওপর পাখী আঁক্‌তো সে ব'সে ব'সে,—ওহে নিরঞ্জন, আরে শুনে যাও হে, তোমাদের ওয়ার্ড থেকে কে কে দাঁড়াচ্ছে এবারকার ইলেকশনে ?'

নিরঞ্জন থামিয়া কহিল, 'মদনমোহন পাল।'

'তাই নাকি? ওর এত টাকা হোলো কবে? পারবে ম্যানেজ করতে? ক'খানা মোটর ভাড়া করেছে? ক'জন ক্যান্‌ভাসার?'

নিরঞ্জন কহিল, 'সে অনেক বড়বাবু।'

বড়বাবু কহিলেন, 'বেশ বেশ, লোকটা কিন্তু খুব সাচ্চা। নতুন আইডিয়াজ্‌ আছে, খুব ভদ্র। হবে না? বনেদী বংশ যে।'

নিরঞ্জন কহিল, 'হাজার ত্রিশেক টাকা খরচ করবে।'

'বলো কি হে, তিরিশ হাজার? আমাদের কাগজে কিছু ঢালুক না, তুলে ধরবো খুব। ডবল কলমে নাম ছাপবো।'

নিরঞ্জন কহিল, 'তা বুঝি জানেন না? আমাদের ডিরেক্‌টরের বন্ধুর সঙ্গে তাঁর আদায়-কাঁচকলায়।'

'তাই নাকি? তবে ত এক হাত নিতে হবে!' বলিয়া বড়বাবু ঘণ্টা বাজাইলেন। বেয়ারা আসিয়া হাজির হইল। তিনি কহিলেন, 'উমাপদবাবুকে ডাকো।'

উমাপদবাবু আসিল। বড়বাবু কহিলেন, 'ইলেক্‌শনের খবর আপনি এডিট্‌ করেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মদনমোহন পালের বিরুদ্ধে কে দাঁড়িয়েছে জানেন?'

উমাপদ বাবু কহিল, 'হরিদাস ঘোষ।'

সম্পাদক কহিলেন, 'হরিদাসবাবুকে তুলবেন খুব,—যান্‌। আর ওই ব্যাটা মদনমোহনকে—বুঝলেন না? বেশ মাঝে মাঝে দু'এক ঘা—'

উমাপদ চলিয়া যাইবার পর কহিলাম, 'কিন্তু হরিদাসবাবুর কোনো পরিচয় ত আমরা···দেশের তিনি কী করেছেন?'

'করেছেন আমার মুণ্ডু।' বড়বাবু একটু থামিয়া কহিলেন, 'টাকা আছে তাঁর, বুঝলে? টাকা, টাকা,—কালকেই দেখতে পাবে তাঁর কাছ থেকে মোটা টাকার চেক্ এসে হাজির।'

নিরঞ্জন বলিল, 'তাতে আমাদের সুবিধে কি বড়বাবু?'

'সুবিধে? টাকা পেয়ে ডিরেক্টর খুশী হবেন, এই সুবিধে। চাই কি, নগদ এক মাসের বাকি মাইনেও পেয়ে যেতে পারি।'

বলিলাম, 'সে ত' আমরা পাবোই, বড়বাবু।'

'না, কাগজের চাকরির টাকা পাওয়া যায় না, ওটা পিছু পড়লেই বাঘে খায়। না দিলে কি কববে? নালিশ? কা'র নামে? লিমিটেড কোম্পানী যে। দেবে লিকুইডেশনে। দেনা দেখিয়ে দেবে দশগুণ। তুমি পাবে ফাইভ্ পারসেণ্ট।—এই যে নরেনবাবু, আসুন, কাপি রেডি।'

বড়বাবু ইহারই মধ্যে কখন কাপি লিখিয়াছেন তাহা আমবা কেহই বুঝিতে পারি নাই। নরেনবাবু কয়েকখানা প্রুফ লইয়া ফাইল করিয়া গেলেন।

'আর শুনুন।' বড়বাবু তাঁহাকে পুনরায় ডাকিলেন, বলিলেন, 'শেষ পৃষ্ঠায় কালকে 'ক্রিষ্টিনার' ছবিটা যাওয়া চাই, অত বড় বিলেতী জাহাজ ডুবির খবর, যেন ভুলবেন না, ওর সম্বন্ধে এডিটোরিয়াল্ রইল। ও দাদু, তোমার কতদূর? তুমি দেখছি আজ আমাকে ভোগাবে। তাইত, স্ত্রীর অসুখ দেখে বেরিয়েছি। কি হে সুকুমার, আবার কি চাই?'

সুকুমার একটি 'ইউ-পির' সংবাদ লইয়া কহিল, 'এ খবরটা কি আজ চালিয়ে দেবো?'

বড়বাবু কাগজখানা লইয়া কহিলেন, 'ওঃ, সেই হরিজন বালিকার রহস্যময় মৃত্যু! যজ্ঞেশ্বর তীর্থে সনাতন হিন্দু মন্দিরের চৌকাঠে মাথা রাখিয়া কুসুমসুন্দরী নামক এক বালিকার দেহত্যাগ!'

উঠিয়া দাঁড়াইয়া রুদ্ধশ্বাসে কহিলাম, 'সত্যি ঘটনা বড়বাবু, আমি জানি, আমি ছিলুম সেখানে। সে যে কত বড় ট্রাজেডি—'

বড়বাবু হাত নাড়িয়া কহিলেন, 'বসো তুমি, হৃদয়াবেগের জায়গা খবরের কাগজের অফিসে নেই, ওটা মেরে আসতে হয়। ট্রাজেডির তুমি কী জানো? রোগে ভুগে মরেছে ঠাকুরের দরজায়, এই মাত্র! একে ট্রাজেডি বলে না, মৃত্যু মানে ট্রাজেডি নয় হে।'

তাঁহার মুখের দিকে আমরা সকলে তাকাইলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'ট্রাজেডি আমাদের জীবনে, কারণ আমরা বেঁচে আছি! তুমি, আমি, নিরঞ্জন, সুকুমার, নরেন,—এরা ট্রাজেডি; এরা না খেয়ে কাজ করে, উপবাস ক'রে হাসে, যাদের কাছে অপমানিত হয় তাদের তোষামোদ করে! মৃত্যুটা চরম কথা, শান্তির কথা,—কিন্তু আমরা যারা টিঁকে আছি, যাদের পরিবারে গভীরতর অসন্তোষ—যাদের ভাইরা বেকার, সন্তানরা স্বাস্থ্যহীন, স্ত্রীরা রুগ্ন, চাকরির জন্যে যারা কুকুরের মতন দরজায় দরজায় লাথি খেয়ে—, যাও সুকুমার এখান থেকে, সঙ দেখছ,

কেমন ? যাও, ইলেক্‌শনের খবরগুলো ভালো ক'রে সাজিয়ে ছাপো গে। 'হরিজন বালিকা' ব'লে মড়ার গায়ে ছাপ মেরে দিয়ো না, হরিজন মানে হিন্দু।'

সুকুমার চলিয়া গেল। টেব্‌লের সম্মুখে এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া নিবারণ লিখিয়া যাইতেছিল, এতক্ষণে তাহার উপর বড়বাবুর নজর পড়িল। কহিলেন, 'ওহে ছোটবাবু—'

সহকারী সম্পাদক বলিয়া আমরা সকলেই নিবারণবাবুকে 'ছোটবাবু' বলিয়া ডাকি। নিবারণ মুখ তুলিয়া কহিল, 'কি বলুন ?'

বড়বাবু বলিলেন, 'ম্যানেজিং ডিরেক্‌টর আমার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। গিয়ে জানালেন, এই 'স্বাধীনতা' কাগজের জন্য তাঁর পঁচিশ হাজার টাকা দেনা। আমাকে বললেন, স্টাফের খরচ কমানো যায় কিনা। আমি বললাম, না। কেউ পায় ত্রিশ, কেউ চল্লিশ, তুমি পাও পঞ্চান্ন, আমি একশো,—এর ভেতরে খরচ কমাবো কা'র থেকে ? আমার নিজের মাইনে তোমাদের চেয়ে বেশি, একশোর কমে আমি থাক্‌তে পারব না, আমার সাতটি ছেলেমেয়ে, বাড়ী ভাড়া, পথ খরচ। মাইনে বাড়ানো চুলোয় যাক্‌, কমাবো কোন্‌ মুখে ? দরিদ্রকে বঞ্চিত করবো ? কিন্তু নিবারণ, তোমার গতিবিধি দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'কেন বড়বাবু ?'

বড়বাবু কহিলেন, 'আমাদের প্রেস-ম্যানেজারের সঙ্গে তোমার ভারী ভাব। আমি জানি আমার বিরুদ্ধে তোমরা দুজনে কী যেন একটা পরামর্শ করো।'

'কী বলছেন আপনি ? আপনার বিরুদ্ধে পরামর্শ ? এমন অন্যায় সন্দেহ কবে হোলো আপনার ?'

'আঃ, থামো। তোমার গলার আওয়াজ শুনলে এদের মনে হবে, তুমি বুঝি সত্যিই কিছু জানো না। তুমি সব জানো, নিবারণ। আমার এই একশো—আমার প্রতি তোমাদের দু'জনের একটা গভীর ঈর্ষা আছে।'—বড়বাবু বলিলেন, 'তোমরা দু'জনে আমাকে লুকিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে নিয়মিত যাও। কেন যাও ? স্তব-স্তুতি করতে ? তাঁকে তোমরা জানিয়ে এসেছ যে, তোমরা খরচ কমাতে পারো! কেমন, এই না ? বাঙালী জাত গোয়েন্দাগিরি করতে ওস্তাদ; ক্ষুদ্রচেতা, পরশ্রীকাতর। নিজে বাঁচবে না, অন্যকে বাঁচতে দেবে না। You will not grow yourself and won't allow others to grow. 'জাতের জীবনে যক্ষ্মা ধরিয়ে দিলে কুচক্রী ভবানন্দর দল!'—বলিয়া সম্পাদক মুখ ফিরাইলেন।

নিবারণ কহিল, 'এর পরে আপনার সঙ্গে কথা কওয়া চলে না। আপনার মুখের সংযম নেই।'

'কেমন ক'রে থাকবে ? জানো তুমি, কর্তৃপক্ষের সামান্য 'ফেবার' পাবার আশায় তোমার বন্ধুদের কত বড় সর্ব্বনাশ করছ ? তাঁর যদি পঁচিশ হাজার টাকা দেনা হয়, তার জন্যে কি আমরা দায়ী ?'

এইবার নিবারণ কহিল, 'কিন্তু আমরা যদি 'স্বাধীনতা'র জন্যে কিছু স্বার্থত্যাগ করি, তবে কি কাগজখানা বাঁচতে পারে না ?'

বড়বাবু কহিলেন, 'কাগজ বাঁচবার জন্যে স্বার্থত্যাগ করবে ?

সে ত্যাগটা কেমন? যারা ভিকিরী, যারা নিরন্ন, তাদের আবার ত্যাগ কি? তুমি যা মাইনে পাও, তার থেকে পাঁচ টাকা কমালে তোমার চলবে কেমন করে?'

'আমার চল্‌বে, বড়বাবু।'

'তোমার চলবে কিন্তু ওদের চলবে না। ওরা কেউ পায় পনেরো, কেউ কুড়ি, কেউ তিরিশ। যারা দু'লাখ পাঁচ লাখের কারবার করে, তাদের দশ-বিশ হাজার গায়ে লাগে না, কিন্তু যাদের কুড়ি টাকা থেকে পাঁচ টাকা যায়, তারা জানে এই লোকসান কত বড়!'

নিবারণ কহিল, 'আমরা সহ-সম্পাদকরা যদি বাজার থেকে কিছু কিছু বিজ্ঞাপন আদায় ক'রে আনি, তাহ'লে ত কাগজখানার কিছু সুবিধে হয়!'

'হা ভগবান!' বড়বাবু কহিলেন, 'এই মন্ত্র দিয়েছে তোমাকে ম্যানেজার, কেমন? তোমরা আন্‌বে বিজ্ঞাপন আদায় ক'রে, এমন নিয়ম কোনো শাস্ত্রে নেই। কেন আন্‌বে? কেন জাত খোয়াবে? তুমি সাব-এডিটর, তোমার সম্মান আছে, সমাদর আছে। তুমি যদি বিজ্ঞাপন আনো, তবে ম্যানেজার আছেন কোন্ কাজ নিয়ে? তাঁর অকর্ম্মণ্যতা আমরা ঢাকতে যাবো নিজেদের মাইনে কমিয়ে? কিছুতেই নয়। এই কাগজের ব্যবসার দিকটা তাঁর হাতে, এর লাভ-লোকসানের জন্যে তিনি দায়ী,—একজনের অক্ষমতার জন্যে এতগুলি লোক দুঃখ পাবে? না, সে আমি হ'তে দেবো না। নিবারণ, তুমি আমার শত্রুতা করতে পারো, আমার বিরুদ্ধে গোপনে তুমি গিয়ে ডিরেক্টরকে

প্রভাবান্বিত করতে পারো—কিন্তু আমার ডিপার্টমেণ্টের কারো মাইনে আমি কমাবো না। কারণ তারা দরিদ্র, তারা সকলেই অভাবগ্রস্ত!'

নিবারণের চেহারাটা আজ আমাদের সকলের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার দোষ নাই। ডিরেক্টরের স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিতে পারিলে চাই কি অন্যত্র ভালো চাকরি মিলিয়া যাইবে। তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি; তাঁহার দল আছে, দলাদলি আছে; কংগ্রেসে, কর্পোরেশনে ও কাউন্সিলে তাঁহার বিশেষ প্রভাব। নিবারণ বড় গাছেই নৌকা বাঁধিয়াছে।

টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বড়বাবু রিসিভারটা তুলিয়া কানের কাছে ধরিলেন—'হ্যালো। ও আপনি? হ্যাঁ, বলুন? পোলিং-ডেট্ পঁচিশে? আচ্ছা জানিয়ে দেবো। আপোষ হয়েছে? কন্‌ডিশন্‌গুলো কি? কালকের রেজোলিউশন? হ্যাঁ, ছাপবো। আসবেন না কি এখানে? আচ্ছা ঘণ্টাখানেক থাক্‌ব। কি বলছেন, নমিনেশন্ পেয়েছে? খয়ের খাঁ, বুঝলেন না? বাংলাদেশে অনেক বিভীষণ আছে। আচ্ছা আসবেন, আমি আছি।'

বড়বাবু টেলিফোন্ ছাড়িয়া দিলেন।

'এই বাংলাদেশেই একদিন রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, **ঈশ্বরচন্দ্র** বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ **জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বাংলায় আজিও রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র,**

ব্রজেন্দ্র শীল জীবিত। অধ্যাত্মজগতে রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ; সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ, জাতীয় জীবন চিত্তরঞ্জন। বাঙালীর সাধনা, বাঙালীর ত্যাগ, বাঙালীর বিদ্যা—'

দ্রুতহস্তে আমি লিখিয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় বাহিরে সাড়া পড়িয়া গেল! ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাসবিহারী মুখার্জ্জি আসিয়াছেন। আমরা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিবারণ তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল, আমরা হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া পুনরায় নিজেদের কাজে বসিয়া গেলাম।

রাসবিহারীবাবু সম্পাদকের কাছে গিয়া বসিলেন। হাসিয়া কহিলেন, 'আজকে তোমার লীডার খুব ভালো লেগেছে, ধনঞ্জয়।'

বড়বাবু হাসিয়া উত্তর দিলেন,—'খেতে না পেলেই পাখীর গলা মিষ্টি হয়, মিস্টার মুখার্জ্জি।'

'সে কি হে?'—বলিয়া রাসবিহারীবাবু একটু লজ্জিত হইয়া আমাদের সকলের দিকে একবার তাকাইলেন। পুনরায় কহিলেন, 'এ মাসের দরুন কিছু টাকা স্যাংশন্ করেছি, তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নিয়ো। বড় টানাটানি, বুঝলে ধনঞ্জয়?'

বড়বাবু কখনো চক্ষু লজ্জা করিয়া কথা বলেন না। কহিলেন, 'নিজেদের অভাব এত বড় যে, আপনাদের টানাটানির কথা মনেই হয় না, মুখুজ্যে মশাই। আমি এদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি টাকা পাই, খাতা-কলমেই এটা লেখা আছে।

কিন্তু একমাসের পুরো মাইনে আজ পর্য্যন্ত চোখে দেখলুম না। এরা পরিশ্রম করবে কী খেয়ে? এদের উৎসাহ দেবো কী ব'লে? আপনি থাকেন চৌরঙ্গীর এক বিরাট অট্টালিকায়, আপনাকে কেমন ক'রে বোঝাবো তাদের প্রতিদিনের দারিদ্র্য, যারা আপনার ছাপাখানার মধ্যে ব'সে হরপ সাজায়? প্রত্যেক মাসের মাইনে তারা পায় না,—কোনোদিন দু'টাকা, কোনোদিন তিনটাকা, তাও ধর্ম্মঘট করবার ভয় দেখিয়ে আদায় করে।'

রাসবিহারীবাবু হাসিয়া কহিলেন, 'ধনঞ্জয়, তুমি উত্তেজিত হয়েছ। কিন্তু দেশে কারবারের অবস্থা তোমার জানা নেই। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন; গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য —আইনকানুন আমাদের হাতে নেই—'

'কী করব শুনে?'—ধনঞ্জয় বলিলেন, 'তবু ত দেখছি ক্রোর-পতির দল স্বার্থ-সাধনায় মশগুল। আপনারা দলপুষ্টি করছেন, পার্টি দিচ্ছেন, যাচ্ছেন কর্পোরেশনে কাউন্সিলে ক্ষমতার লোলুপতায়। আপনার বিরাট জমিদারী, প্রকাণ্ড কারবার, ব্যাঙ্কে লক্ষ লক্ষ টাকা,—ঈর্ষা করিনে, ঘৃণা করিনে, কিন্তু আমাদের খেতে দিন, সম্ভ্রম বাঁচাতে দিন, আমরা শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। আমাদের মা-বোন আছে, স্ত্রী আছে, সন্তান আছে।'

মুখুজ্যে মশাই বলিলেন, 'তবে যে নিবারণ আমাকে ব'লে এলো—'

সম্পাদক উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, 'নিবারণ আপনার খরচ বাঁচিয়ে

আপনার সুনজরে পড়তে চেষ্টা করছে। ও কি চায় জানেন? আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে এখান থেকে সরাতে চায়—'

নিবারণ চটিয়া উঠিল, 'কহিল, এ সমস্ত কিন্তু ব্লাস্‌ফেমি,—আমার কোনো দোষ নেই। আমার প্রতি এরকম ইন্‌সল্ট্‌, আমি কিন্তু—আমি কিন্তু এ চাকরি ছেড়ে দেবো, মিষ্টার মুখার্জ্জি।'

রাসবিহারীবাবু মুখ ফিবাইয়া কহিলেন, 'থামো, চাকরি ছাড়ার ভয় দেখিয়ো না, দেশে বেকারের অভাব নেই, ডাকলেই একজন জুটে যাবে তোমার বদলে। কিন্তু ধনঞ্জয়কে আমি ছাড়তে পারব না, মনে রেখো নিবারণ। সত্যিই কি ওর বিরুদ্ধে তুমি—'

'মোটেই নয়, মিস্টার মুখার্জ্জি।'—বলিয়া একটা আর্ত্তনাদ করিয়া নিবারণ বসিয়া পড়িল।

'ধনঞ্জয়, একটা কথা কিন্তু তোমাকেই রাখতে হবে। নিজের মাইনে তুমি কমিয়ো না, কিন্তু আব সকলের মাইনে পাঁচ টাকা ক'বে না কমালে আমি আব লোসকান দিয়ে পেরে উঠিনে।' রাসবিহারীবাবু ধনঞ্জয়কে মিনতি কবিলেন।

'কি বলছেন আপনি? সে ওরা রাজি হবে কেন? আমি তাদের উপকার করতে পারিনে অথচ অনিষ্ট করব? না, মুখুজ্যে মশাই, তার চেয়ে আপনি অন্য সম্পাদক খুঁজে আনুন।'—বলিয়া কলমটা টেব্‌লের উপর ফেলিয়া 'স্বাধীনতা' সম্পাদক হাত গুটাইয়া বসিলেন।

রাসবিহারীবাবু কহিলেন, 'তুমি আমার লোকসানটা দেখবে না, ধনঞ্জয় ?'

ধনঞ্জয়বাবু এবার নরম হইয়া কহিলেন, 'আমি যাঁর কাছে চাকরি করি, তাঁর লোকসান আমার গায়ে লাগবে, সে আমি জানি। কিন্তু তাঁর জন্যে দায়ী আমরা—গরীবরা হ'তে যাবে কেন, বলুন ? লোকসানের জন্যে দায়ী আপনার ম্যানেজার, তাঁর যোগ্যতার অভাব, তাঁর আলস্য, তাঁর অপরিণামদর্শিতা। আপনাব কাববারের উন্নতি করুন, লোকসানের মাত্রা কমিয়ে আনুন। সংবাদপত্র মানেই ত ক্ষতি! সে ক্ষতি আপনাকে স্বীকার করতেই হবে দলপতি হওয়ার গৌরব নিয়ে—ক্ষমতা আহরণের গোড়ায় আছে ত্যাগস্বীকার।'—একটু থামিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, 'মিস্টার মুখার্জ্জি, 'স্বাধীনতার' ভিতর দিয়ে গণতন্ত্র প্রচার করতে যাওয়াটাই ভুল হয়েছে, কারণ এ কাগজ যাঁদেব, তাঁরা ধনী সম্প্রদায়! এদেশেব সব সংবাদপত্রই প্রায় ধনবানদের অধিকারে। কেউ জমিদার, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ রাজা-মহারাজা! তাঁদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে··· বুঝলেন না, আর যাই হোক, সোস্যালিজ্‌ম্ হয় না। কর্ম্মী সম্প্রদায়ের হাতে ক্ষমতা যতদিন না আসবে, যতদিন অর্থসম্পদ সমানভাবে বিতরণ না হবে, ততদিন—'

রাসবিহারীবাবু কহিলেন, 'কিন্তু 'স্বাধীনতা'য় এই কথাই ত লেখা হয়, ধনঞ্জয়।'

করুণার হাসি হাসিয়া সম্পাদক কহিলেন, 'কে বললে ? কাগজ বোধ হয় আপনি পড়েন না! দরিদ্রের জন্য কান্নাকাটি

ছাপা হয়, কিন্তু আসল কথা মুখ ফুটে বলি নে। গভর্ণমেণ্টকে বরং সমালোচনা করতে পারি, কিন্তু আপনাদের চটাতে পারি নে। জেল্ খাট্‌তে ভয় পাই নে, কিন্তু আপনাদের অসন্তোষের কারণ ঘটালে উপবাস ক'রে মরতে হবে স্ত্রীপুত্র নিয়ে।'

'কী যে বলো তুমি, ধনঞ্জয়!' বলিয়া ম্যানেজিং ডিরেক্‌টর একটু হাসিলেন। পুনরায় কহিলেন, 'তুমি কি বলতে চাও, দেশের সত্যকারের ব্যথা আমাদের কাগজে প্রকাশ পায় না?'

'না।' সম্পাদক কহিলেন, 'আপনাদের কাগজে থাকে কেবল স্বরাজ পাবার কথা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, অনুন্নত সম্প্রদায়, এবং বড় জোর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। কিন্তু এ ছাড়াও দেশ আছে। আমার মতন পঞ্চাশ লক্ষ বেকার কেবল এই বাংলা-দেশেই উপবাসে মরছে; স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষাহীন কোটি কোটি স্ত্রীলোক, কোটি কোটি নিরন্ন চাষী আর মজুর, দুর্ভিক্ষ আর মহামারীপীড়িত সহস্র সহস্র গ্রাম—এদের আর্ত্তনাদ আপনার চৌরঙ্গীর অট্টালিকার দরজায় পৌঁছয় না। এদের হাতে ক্ষমতা এলে আপনাদের বিপদ, তাই এদের দুর্গম অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়ে আপনারা নিরাপদ জীবন যাপন করছেন। যাক্‌গে মিস্টার মুখার্জ্জি, এ নিয়ে অনেক কথাই বলা যায়, আমাদের আবার রাত হয়ে গেল।'

মিস্টার মুখার্জ্জি অনেকক্ষণ বসিয়া কাগজপত্র নাড়া-চাড়া করিলেন, কিন্তু আসল কথাটা তিনি ভুলিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'তাহ'লে আমার প্রস্তাবে তুমি রাজি নও, ধনঞ্জয়?'

সম্পাদক কহিলেন, 'আপনার প্রস্তাবে রাজি হ'তে গেলে আমার সমস্ত পলিসিকে নষ্ট করতে হয়, ভাঙতে হয় আমার আদর্শের মূল নীতি। ওটা আমি পারব না, মুখুজ্যে মশাই।'

মুখুজ্যে মশাই কহিলেন, 'ধনঞ্জয়, সোনার ডিম পেতে গেলে হাঁসটাকে মারলে চলে না। কাগজ বাঁচলে তবেই লাভ, তবেই কারবার। তোমার পলিসিই বলো, আর আদর্শের মূলনীতিই বলো, সবই 'স্বাধীনতা'র মরণ-বাঁচনে নির্ভর করছে। আচ্ছা, আমি এখন চললুম।'

সম্পাদক কহিলেন, 'নমস্কার।'

নমস্কার লইয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর বাহির হইয়া গেলেন। নিচে তাঁহার মিনার্ভা কার্ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

সম্পাদক ডাকিলেন, 'নিবারণ?'

নিবারণ মাথা তুলিলেন। সম্পাদক পুনরায় কহিলেন, 'কাগজখানা তুমি চালাতে পারো?'

'কোন্ কাগজটা? দেখুন ধনঞ্জয়বাবু, আপনার সোজাবাঁকা কোনো কথাটারই আমি মানে বুঝতে পারি নে।'

'ক্রমশ বুঝবে, তুমি সবই একটু দেরিতে বোঝ—সরল কিনা! বলছি যে, তুমি যদি 'স্বাধীনতা'র সম্পাদক হও, চালাতে পারবে?'

নিবারণ কহিল, 'ওসব বাজে কথা আমি ভাবিই নে।'

'আচ্ছা, ভাবোই না একবার। ধরো পুলিশ আছে, প্রেস-অফিসার আছে, তার উপর আছেন রাসবিহারীবাবুরা—সবাইকে খুশী রাখতে পারবে? এদের মধ্যে একজন চটলেই তোমার

চাকরি আর কাগজ যাবে গোল্লায়। মনে রেখো।' সম্পাদক তাঁহার তর্জ্জনী তুলিলেন।

মুখের একটা শব্দ করিয়া নিবারণ কহিল, 'চাকরি রাখতে হয় কেমন ক'রে সে ত আপনিই ভালো জানেন। যাক্‌গে, আমার কাজ হয়ে গেছে, আমি চললুম, নমস্কার।' বলিয়া সে কেমন যেন অন্তরের জ্বালা প্রকাশ করিয়া সেদিনকার মতো তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

রাত অনেক হইয়াছে। কাগজপত্র গুটাইয়া, সুকুমার, নরেন, নিরঞ্জন প্রভৃতিকে উপদেশ দিয়া সেদিনের মতো বড়বাবুও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার স্ত্রীর অসুখ, আর দেরি চলিবে না। ছাতাটা লইয়া আমার নিকট আসিয়া কহিলেন, 'কি হে, তোমার যে এখনো শেষ হয়নি, কী ভাবছো?'

আমার তখন আর একটু বাকি ছিল। বড়বাবু কহিলেন, 'দেখো ভাই, যেন সিডিশন্ লিখো না, দিনকাল খারাপ!'

হাসিলাম। বলিলাম, 'বাঙালীর শিক্ষা-সংস্কৃতির সম্বন্ধে সত্য কথা লিখবো, সিডিশন্ হবে কেন?'

বড়বাবু বাহির হইয়া যাইবার সময় হাসিয়া কহিলেন, 'ছেলেমানুষ তুমি, সত্য কথা মানেই ত আজকাল সিডিশন্!'

দিন কয়েক পরের কথা বলিতেছি। কোনো বাক্‌বিতণ্ডা নাই, সকলেই কাজ লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু মনে হইতেছিল, কোথায় যেন বারুদ জমিয়া উঠিয়াছে; একটু আগুনের ফিন্‌কি অথবা সামান্য একটু সংঘর্ষণ—অমনি সশব্দে চারিদিক বিদীর্ণ হইয়া

যাইবে। ইহার কারণ সেই পুরাতন কথা—রাসবিহারীবাবু এখনো কাহাকেও বেতন দেন নাই; কাল দিব, পরশু দিব করিয়া প্রায় এক মাস হইয়া গেল। প্রেস বিভাগ, বিজ্ঞাপন বিভাগ, হিসাব বিভাগ, সম্পাদকমণ্ডলী—সকলেই আশায় আশায় দিন কাটাইয়া নিরাশ হইতেছে। রাসবিহারীবাবু কখন্ আসেন, কাহার সহিত চুপি চুপি কী কথা বলেন, এবং কখন্ হুস করিয়া মোটরে চড়িয়া চলিয়া যান্ তাহা কেহ দেখিতেও পায় না, বুঝিতেও পারে না। সকলে প্রায় তিন মাস ধরিয়া বেতন পায় নাই। ইহা নূতন নহে, এমনি করিয়াই পাঁচ বৎসর চলিতেছে।

কিন্তু বারুদে আগুন লাগিল না, সংঘর্ষও হইল না, অকস্মাৎ নীচের তলা হইতে সংবাদ প্রচারিত হইল, প্রেসের লোকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে, তাহারা দল পাকাইয়া গেটের ভিতরে ও বাহিরে দাঁড়াইয়া হুম্‌কি দেখাইতেছে। কাজ ত আর তাহারা করিবেই না, বরং অশান্তি ঘটাইবে।

দৈনিক কাগজে প্রেসের লোকেরা ধর্ম্মঘট করিলে বিশেষ বিপদ, কোনো মুহূর্ত্তেই কাজ বন্ধ থাকিলে চলে না। ষোলটি পৃষ্ঠা ভরানো চাই। তৎক্ষণাৎ ডিরেক্‌টরগণের নিকটে টেলিফোনে খবর গেল, তাঁহারা টেলিফোন যোগেই উপদেশ পাঠাইতে লাগিলেন। রাসবিহারীবাবুকে অনেক অনুরোধ করা হইল, তিনিও উপদেশ পাঠাইলেন, কিন্তু ছাপাখানার এই ভূত-প্রেতের দলের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না। কি জানি, অভাবের তাড়নায় উহারা সব করিতে পারে। তিনি

জানাইলেন, নিকটেই পুলিশের থানা আছে ; তবে আশা করি, প্রয়োজন হইবে না।

আজ আমার উপর ভার পড়িয়াছিল, প্রাচীন ভারতের সভ্যতার সম্বন্ধে একটি আর্টিকেল্ লিখিবার জন্য। তখন মানুষে মানুষে হানাহানি হইত না, ধর্ম্মের জয় হইত, বনের ফলমূল খাইয়া মানুষ আনন্দে থাকিত। মুনি-ঋষিরা অরণ্যে বসিয়া তপস্যা করিতেন, তাঁহাদের আদর্শ ছিল মানব-সমাজের বৃহৎ ঐক্য, বৃহত্তর সামঞ্জস্য। তখন ছিল মহৎ জ্ঞান, মানুষ দৈবভাবে অনুপ্রাণিত থাকিত। আমি কাগজ টানিয়া লিখিবার আয়োজন করিতেছিলাম।

এমন সময় সম্পাদক দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিলেন, তাঁহার পিছনে পিছনে রাসবিহারীবাবু ও নিবারণ। উত্তেজিত হইয়া সম্পাদক কহিলেন, 'মিথ্যে অনুরোধ, অন্যায় অনুরোধ মিস্টার মুখার্জ্জি, ওরা দরিদ্র, ওরা হতভাগ্য···ওদের অন্নে হাত দেবো আমি, এ পাপ, এ লজ্জা—'

রাসবিহারীবাবু কহিলেন, 'অনুরোধ রাখো ধনঞ্জয়, তুমি একটা দস্তখৎ দিলেই ওরা শুন্‌বে, ওরা তোমাকে ভালোবাসে !'

'ভালোবাসে, তাই করব এত বড় অনাচার ? ওদের মাইনে কমাবো, ওরা খাবে কি, ওরা পরবে কি ? আপনি কেমন ক'রে জানবেন রাসবিহারীবাবু, দরিদ্রের ঘরের নিত্য অনটন ?'

মুখার্জ্জি কহিলেন, 'আবার ওদের মাইনে বাড়িয়ে দেবো ধনঞ্জয়, এই বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হ'তে দাও। ওরা তোমার কথা শুনবে, তুমি ওদের বিশেষ প্রিয়—এই অনুরোধটা রাখো—

আজ প্রত্যেককেই দু'মাসের মাইনে দেবো, কিন্তু ওই—প্রতি কুড়ি টাকায় পাঁচ টাকা কম—এই সামান্য স্বার্থত্যাগটুকু—'

নিবারণ কহিল, 'ওরা কমাতে রাজি হয়েছে, তবে আপনার আপত্তি কি, বড়বাবু ?'

সম্পাদক সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, 'কে বললে ওরা কমাতে রাজি ?'

'আমি জানি। আপনার জন্যেই ত বাধা, আপনি একটা সই দিলেই আমরা অফিসসুদ্ধ সবাই সই করব।'

'সত্যি বলছ, নিবারণ ?'

উৎসাহিত হইয়া নিবারণ কহিল, 'কাগজখানায় আপনি আগে সই ক'রে দিন, তারপর দেখুন আমি সকলেরই সই আনতে পারি কিনা।'

ধনঞ্জয় শান্ত হইয়া একবার সকলের মুখের দিকে তাকাইলেন। তারপর কহিলেন, 'ও, তাই নাকি ? দিন্ কাগজ রাসবিহারীবাবু।' বলিয়া কাগজখানা লইয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে নিজের নাম দস্তখত করিয়া দিলেন। সেখানা লইয়া নিবারণ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। মনে হইল, ভিতরে ভিতরে কোথায় একটা ষড়যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া আছে।

পনেরো মিনিট কাল আমরা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম ; তারপর নিবারণ হাসিমুখে ফিরিয়া আসিল। বিজয়োল্লাসে সে কাগজখানা রাসবিহারীবাবুর হাতে দিল,—এখনই টাকা পাইবে বলিয়া প্রত্যেকেই মাহিনা কমাইবার সম্মতি দিয়াছে, কেহ বাদ যায় নাই। সম্পাদক পাথরের মতো নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

রাসবিহারীবাবু কটাক্ষে ধনঞ্জয়ের দিকে তাকাইলেন, তারপর আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, 'ওঁর সই নিলে না যে নিবারণ ?'

আমি ঘাড় হেঁট করিলাম। নিবারণ কহিল, 'ওঁর সই দরকার নেই, উনি বিনা মাইনেয় নতুন কাজ শিখতে এসেছেন, এখনো বড় খাতায় ওঁর নাম ওঠেনি।'

রাসবিহারীবাবু পকেট হইতে চেক্-বই বাহির করিয়া কোন্ এক ব্যাঙ্কের নামে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক্ কাটিলেন; সম্পাদকের দস্তখৎ পাইয়া তাঁহার আজ প্রায় আড়াই হাজার টাকা বাঁচিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'ম্যানেজারের কাছ থেকে এখুনি তোমরা টাকা পাবে, ধনঞ্জয়। টাকা পেলেই ওরা ধর্ম্মঘট ভাঙবে। প্রেস যেন বন্ধ হয় না। নিবারণ, রাত্রে তুমি একবার আমার কাছে যেয়ো।'

'যে আজ্ঞে।'—বলিয়া নিবারণ পুনরায় তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

রাসবিহারীবাবু চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে ধনঞ্জয় মাথা তুলিলেন। তাঁহার দুই চোখ ভারাক্রান্ত হইয়া আসিয়াছে। কহিলেন, 'দাদু, নিজের মাইনে কমাইনি কেন জানো ? ওরাই একদিন যাবে আমার কাছে ধার চাইতে, হাত পেতে ভিক্ষে করবে দু'টাকা, একটাকা, চার আনা,—হায়রে দুর্ভাগ্যের দল, হায়রে অধঃপতিত জাত।'

আমরা সবাই চুপ করিয়াছিলাম, কিন্তু বড়বাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ওদের জন্যে ওকালতি করতে গেলুম,

ওরাই সই দিয়ে আমাকে লজ্জা দিলে। দাহু, এমন কেন হয় জানো? অশিক্ষা নয়, পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, কিন্তু ওরা জানে পৃথিবীতে দুর্ব্বলের সহায় কেউ নেই, ওরা জানে শক্তিমান্ ধনিকের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো বীর্য্য ওদের নেই। তাইত বলি, ম'রে যাক্, ঘুচে যাক্, মুছে যাক্।'

বলিতে বলিতে তাঁহার গলা ভারী হইয়া আসিল, পুনরায় কহিলেন, 'আজ আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেল। এর পরে রইল জর্ণালিজ্‌ম্ নিয়ে গণিকাবৃত্তি। অর্থাৎ সংবাদপত্র সেবার মানে বারো আনা মোসাহেবী, দু'আনা গোয়েন্দাগিরি, বাকী দু'আনা চুক্‌লি-কাটা। কিন্তু তবু আজ চাকরি ছাড়বার সময়ে তোমাকে বলে দিয়ে গেলুম, এরা একদিন দাঁড়িয়ে উঠ্‌বে, একদিন আনবে প্রচণ্ড বিপ্লব; এদের সকলের উন্মত্ত অসন্তোষ ঝড় তুলবে ওদের প্রাসাদে-প্রাসাদে, কঙ্কালসার নিরন্ন দুর্ব্বলের বুকের আগুন চল্‌তি সমাজকে ছারখার ক'রে দেবে।'

শেষ